প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৬ ❖ ১৬ - ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

# একুশের মূল ভাবনা

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও আমাদের করণীয়

## একুশে ফেব্রুয়ারি: আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় প্রেরণা

## অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী

## বিশ্বাস ও আশায় পানজোড়াতে সাধু আন্তনী'র তীর্থোৎসব

# পরলোকে মি: বেঞ্জামিন গমেজ ঢালি

জন্ম: জানুয়ারি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

আমাদের বাবা মি: বেঞ্জামিন গমেজ (কাফরুল, ঢাকা) গত ২১ ডিসেম্বর নিজ বাসভবনে (কাফরুলে) এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে আমাদের কাঁদিয়ে প্রভুতে নিদ্রিত হন। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ উপজেলার পুরাতন বান্দুরা গ্রামের ঢালি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন, তার বাবা ছিলেন স্বর্গীয় পল নাগর গমেজ ঢালি এবং মা স্বর্গীয়া আন্না গমেজ। বাবা ও পিসি ছিলেন দুই ভাই বোন মাত্র। আমাদের বাবা জন্মের ৩ মাস পরেই পিতৃহারা হন আর অনেক ছোট বয়সেই মাকে হারান। কিন্তু জীবন যুদ্ধে তিনি হেরে যাননি। মিশনারী ফাদার, আত্মীয় স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষীদের স্নেহে এবং নিজ চেষ্টায় জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বি কম পাশ করেন। দীর্ঘ দিন তিনি বাংলাদেশের স্বনামধন্য NGO, RDRS এর প্রধান হিসাব রক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ এবং সৎ হিসাবরক্ষক।

যুবক বয়স থেকেই তিনি ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন এ সেবা দান করেছেন। পরবর্তীতে অন্যান্য ঢাকা কেন্দ্রিক ঋণদান সমিতিগুলোতেও যেমন ঢাকা দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ, মাল্টি পারপাস সোসাইটি, আঠারোগ্রাম কল্যাণ সমিতি, কাফরুল খ্রিষ্টান সমিতি, কাফরুল ক্রেডিট-সহ আরও অনেক সমিতিতে নিজের মেধা আর পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক ছিল কাফরুলে প্রভুর জন্য গির্জাঘর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবে রূপ দেওয়া। তিনি এই গির্জা ও মণ্ডলীকে নিজের সন্তানের মত ভালোবাসতেন। সমাজের মানুষের বিপদে-আপদে তার সহযোগিতা বা পরামর্শ পায়নাই এমন বিরল। অভাবে মানুষ হয়েছেন কিন্তু নিজের যখন আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে তখনও অভাবীজনদের ভুলে যান নাই বরং পাশে থেকেছেন।

বেঁচে থাকাকালীন তিনি বর্ণাঢ্যময় জীবনের অধিকারী ছিলেন। পৃথিবী বিভিন্ন দেশে চাকরীসূত্রে এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ভ্রমণ করেছেন। এছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও পরিশ্রমী। নিজ পরিশ্রমে এবং দূরদর্শিতায় কাফরুলে জায়গা কিনে বাড়ী করে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর থেকে বসবাস করেন। সন্তানদের কাছ থেকেও তাই প্রত্যাশা করতেন, তারাও যেন পরিশ্রমী এবং ঈশ্বর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি ঢালি বাড়ীতে ভাইদের মধ্যে অনেকের চেয়ে বয়সে ছোট হয়েও বড় ভাইয়ের ভূমিকা পালন করেছেন। মধ্য বয়সে তিনি ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হলেও প্রিয়তমা স্ত্রীর সেবা ও কঠোর ব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে সুস্থ থেকেছেন। জীবনের পরন্ত বেলায় দুরারোগ্যব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও ঈশ্বরের উপর থেকে বিশ্বাস হারায়নি।

মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, পুত্রবধূ, তিন কন্যা ও জামাতা, স্ত্রী এবং আটজন নাতি নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী সামাজিক বন্ধুদের রেখে চলে গেছেন। তার মৃত্যুপরবর্তী সময়ে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে ফাদারগণ সেবা দিয়েছেন তাদের জন্য রইল শুভ কামনা।

*শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে –*

স্ত্রী: শেফালি গমেজ
পুত্রদ্বয়: পল বুলবুল গমেজ ও রিচার্ড গমেজ
পুত্রবধূ: কাঞ্চন ও টুম্পা গমেজ
তিন কন্যা: মারিয়া গরেট্টি (লিপি), মুক্তা ও পান্না গমেজ
এবং
জামাতাগণ : রবার্ট ক্লাইভ গমেজ, মিঠু করিম ও মিল্টন সুরঞ্জিত রত্ন
নাতি-নাতনীগণ: হ্যারি, হৈমন্তী, অর্পিতা, ধ্রুব, অবন্তিকা, রিদিকা, মনিকা ও বৃষ্টি।

বিজ্ঞ/৪৭/২০২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

**মূল্য : ১০ টাকা মাত্র**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ০৬
১৬ ফেব্রুয়ারি- ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
০৩ ফাল্গুন - ০৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

## সম্পাদকীয়

### আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: সকল ভাষাকে সম্মান জানানোর উপলক্ষ্য

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। দিনটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও মহিমাদীপ্ত একটি দিন। মাতৃভাষা রক্ষা, লালন-পালন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষাকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে যারা অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি। দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ভাষা, ইতিহাস এবং দেশপ্রেমের প্রেরণা ও শক্তির উৎস একুশে ফেব্রুয়ারি।

একুশ আমাদের বাঙালি চেতনাকে করেছে উদ্দীপ্ত, শিখিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। একুশ একটি সংগ্রামের আহ্বান, একটি উজ্জ্বল গৌরবময় স্মৃতির উৎস। মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা ছিনিয়ে আনতে শিখেছি আমাদের ন্যায্য অধিকার। পেয়েছি মুক্তির পথ, এনেছি স্বাধীনতা। বিশ্বের ২০ কোটিরও বেশি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। পৃথিবীর ১৮৮টি দেশে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হচ্ছে।

বাংলার বুকে একুশের একটি অন্যতম সংস্কৃতি হলো প্রভাতফেরি। এ প্রভাতফেরি যেন শুধু অহংকারি লোক দেখানো আত্মপ্রচারণা না হয়। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে একুশ পালনের সার্থকতা নেই। বর্তমানে নগ্নপদে প্রভাতফেরি, শহীদ মিনারে পুষ্পার্পণ, একাডেমিতে আলোচনা সভা, বটতলায় বক্তৃতা, গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠান এসব যেন কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। সুতরাং কেবল ফুল আর অশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে একুশকে বরণ করাই যদি আমরা শোক দিবসের তাৎপর্য সীমিত রাখি- বাংলার বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি যদি জগতের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা না করি তাহলে শহীদের রক্তে রাঙানো একুশ পূর্ণতা পাবে না। স্বার্থক হবে না আমাদের এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতার রক্তবীজ উপ্ত হয়েছিল বায়ান্নর আগুন ঝরা দিনে। এই মুক্ত স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা লিখতে গিয়ে যদি কুণ্ঠিত হয়, ভীত হয় চেতনা অথচ সদম্ভে বিরাজ করে বিজাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও চালচলন, এমন কি দাপ্তরিক কাজকর্ম, তাহলে শোক দিবস আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান হিসেবে যত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নই হোক না কেন তার আবেদন ম্লান হতে বাধ্য।

ব্যবহারিক জীবনে মাতৃভাষাকে কোনরূপ বিকৃতি কিংবা অশুদ্ধভাবে উপস্থাপন করার হীন মনমানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বিশেষভাবে গণমাধ্যমকে এ ব্যাপারে আরও সচেতন ও যত্নশীল উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর, অর্থপূর্ণ, যা কিছু আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আরও প্রাণবন্ত ও সম্পদশালী করবে, তাকে গ্রহণ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। তবে নিজেরটাকে অবজ্ঞা করা হয়।

মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ দিন আমাদের গৌরব ও মহিমার দিন। ভাষা ও সংস্কৃতি একটি দেশের অমূল্য সম্পদ। ভাষা আদান প্রদানের মাধ্যম। মা, মাতৃভূমির মত মাতৃভাষাও একজন ব্যক্তির কাছে পবিত্র ও আপন। তাই সকল ভাষাকে মর্যাদা দিলে পরে আমরা পবিত্র কাজই করে থাকি।

শহীদ দিবস বা একুশে ফেব্রুয়ারি এখন বিশ্বের দরবারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষা ও সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখতে বাঙালির জীবনে অমর একুশে গ্রন্থমেলা বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। এই মেলাকে ঘিরেই বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটছে। এ বিকাশ যেন কোনভাবেই, কোন প্ররোচনাতেই স্তিমিত না হয়। বরং ভাষা শহীদদের রক্তধারায় মুছে যাক সব আবিলতা, হিংসা, পাপ, গড়ে উঠুক মুক্ত সমাজ-চেতনা।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও হাজার হাজার আন্তনী ভক্তের ভক্তিপূর্ণ পদচারণায় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে নাগরীর পানজোরায় সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব পালিত হয়েছে। দেশ বিদেশের আন্তনী ভক্তের বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরম বিশ্বাসে তারা ধ্যান-প্রার্থনায় কায়মনোবাক্যে সাধু আন্তনীর মধ্য দিয়ে প্রেমময় পিতা ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ মনোবাসনা নিবেদন করছে। বিশ্বাসের এই মিলনমেলা আমাদেরকে আশাবাদী করে বিশ্বাসের যাত্রায় আমরা একতাবদ্ধ হয়ে পথ চলতে পারি। †

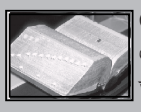

সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত, যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়। উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না, তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ; অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই, তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না। *(যেরে ১৭:৫-৮)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

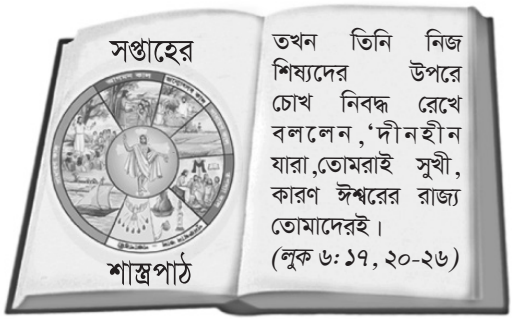


তখন তিনি নিজ শিষ্যদের উপরে চোখ নিবদ্ধ রেখে বললেন, 'দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।
*(লুক ৬: ১৭, ২০-২৬)*

## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ

**১৬ ফেব্রুয়ারি - ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ**

**১৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার**
যেরে ১৭: ৫-৮, সাম ১: ১-৪, ৬, ১ করি ১৫: ১২, ১৬-২০, লুক ৬: ১৭, ২০-২৬

**১৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার**
**সেবা-সংঘের সাত জন পুণ্য প্রতিষ্ঠাতা**
আদি ৪: ১-১৫, ২৫, সাম ৫০: ১, ৮, ১৬খগ-১৭, ২০-২১, মার্ক ৮: ১১-১৩

**১৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার**
আদি ৬: ৫-৮; ৭: ১-৫, ১০, সাম ২৯: ১-২, ৩কগ-৪, ৩খ, ৯খ-১০, মার্ক ৮: ১৪-২১

**১৯ ফেব্রুয়ারি, বুধবার**
আদি ৮: ৬-১৩, ২০-২২, সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৪-১৫, ১৮-১৯, মার্ক ৮: ২২-২৬

**২০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার**
আদি ৯: ১-১৩, সাম ১০২: ১৫-২০, ২১-২২, মার্ক ৮: ২৭-৩৩

**২১ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার**
**সাধু পিটার দামিয়ান**, বিশপ ও আচার্য
আদি ১১: ১-৯, সাম ৩৩: ১০-১১, ১২-১৩, ১৪-১৫, মার্ক ৮: ৩৪-৯: ১ *অথবা শহীদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)*
২ মাকা ৭: ১-২, ৯-১৪, ২২-২৩ বা রোমীয় ৮: ৩৫-৩৯, সাম ৯২: ৯-১৬, লুক ২১: ১২-১৯

**২২ ফেব্রুয়ারি, শনিবার**
**সাধু পিতরের ধর্মাসন**, *পর্ব*
১ পিত ৫: ১-৪, সাম ২৩: ১-৩ক, ৩খ-৪, ৫, ৬, মথি ১৬: ১৩-১৯

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**১৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার**
+ ১৯২৩ সি এম. পল অব দ্যা ইনকারনেশন টবিন, সিএসসি
+ ১৯৫৩ ফা. জন বি. ডেলোনী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ ফা. লুইজি কার্‌রেয়া, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৩ ফা. লুইজি পুজেত্তো, পিমে

**১৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার**
+ ১৯৭৯ ফা. জন কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ সি. পল জুলিয়েট, এসএএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ মাদার কানিসিউস রাভেনেল্লে, সিএসসি
+ ২০১১ বিশপ ফ্রান্সিস এ. গমেজ (ময়মনসিংহ)
+ ২০১৬ সি. মিকেলা ডি'কস্তা, এসসি (ঢাকা)

**১৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার**
+ ১৯৩৬ সি. এম. বার্কম্যান্স, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৪ সি. মারী ভিয়ান্নী স্টোনস্ট্রিট, সিএসসি
+ ১৯৯৪ ব্রা. জেরাল্ড ক্রেগার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২২ সি. সেলিন মার্ডী, সিআইসি (দিনাজ)

**১৯ ফেব্রুয়ারি, বুধবার**
+ ১৯৫৩ বিশপ জে. বি. আনসেলমো (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ব্রা. লিও স্টোক্স, এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৭৮ সি. এম. ভিন্সেন্সিয়া, এমসি

**২০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার**
+১৯৯৭ সি. পাস্কাল, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০১১ সি. লুইজিনা রোজারিও, এসসি (ঢাকা)

**২১ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার**
+ ১৯৯৬ সি. থিওডোরা চেম্পালিল, এসসি (ঢাকা)

**২২ ফেব্রুয়ারি, শনিবার**
+ ২০০৬ সি. কামিল্লা আন্দ্রেয়লা, এসসি (রাজশাহী)

# ফেব্রুয়ারি মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য: যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে আহ্বান।

**আসুন আমরা যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে আহ্বানের জন্য প্রার্থনা করি:** যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে যে যুবরা আহ্বানের বাসনা ও ইতস্ততা উপলব্ধি করছে তাদেরকে প্রতিটি খ্রিস্টান সমাজ যেন সাদরে গ্রহণ করে।

এ মাসের ২ ফেব্রুয়ারি, প্রভু যিশুর নিবেদন পর্ব পালন করছি। এরই সাথে মণ্ডলীতে পালন করা হচ্ছে যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবন-নিবেদন দিবস। এই দিবসে আমরা যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের নিবেদিত জীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি, তাদের জন্য প্রার্থনা করি এবং এই জীবনে আরও অনেকের আহ্বানের জন্য আমাদের অনুনয় নিবেদন করি।

খ্রিস্টীয় বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের একটি অন্যতম সুফলতা হচ্ছে ধর্মীয় জীবনে কারো কারো আহ্বান। এই আহ্বান অনেক সময় পিতামাতা উভয় অথবা তাদের মধ্যে একজন গভীরভাবে উপলব্ধি করে। মণ্ডলীর মধ্যে অনেক পরিবার রয়েছে যারা স্বাভাবিক ভাবে সমাজের সেবা করার জন্য পরিবারের সন্তানদের ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের উৎসাহিত করে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় গঠন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আমার জানামতে একটি পরিবার আছে যেখানে পিতামাতার ১১টি সন্তান ছিল এবং তাদের মধ্যে ৯ জন যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবন গ্রহণ করেছে। ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের জন্য অনেক পিতামাতা সন্তানদের শুধু উৎসাহই দিচ্ছে না বরং তাদের নিয়ে গর্ব বোধ করেন। তাদের কথা ভেবে পারিবারিক জীবনে তারা আনন্দ ও সার্থকতা অনুভব করে। এ ভাবে খ্রিস্টান সমাজের হয়ে পরিবারগুলি যুবদেরকে ধর্মীয় ও সেবাব্রতী জীবনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া একই মণ্ডলীতে বা স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজে বিবাহিত জীবন দ্বারা পরিবারগুলি ধর্মীয় জীবনে সেবাদান করার উদ্দেশে যুবদের প্রেরণা দান করে।

অপর দিকে যুবরাও পারিবারিক জীবনের দান হিসেবে নিজেকে দেখে। তাদের মধ্যে বাসনাও জাগে যেন তারা তাদের কৌমার্য জীবন দিয়ে বিবাহিত জীবনকে ও খ্রিস্টান সমাজকে সেবা করতে পারে।

যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে পিতামাতা ও সন্তানদের এই বাসনা পরস্পরের সম্পূরক ও সেবাদানে নিয়োজিত। অতএব আমাদের একান্ত প্রার্থনা যেন খ্রিস্টান সমাজ ও স্থানীয় মণ্ডলী যুবদের এই বাসনাকে নানাভাবে উৎসাহিত করে, সন্তানদেরকে লালন-পালন ও গঠন-প্রশিক্ষণ দান করে। এভাবে খ্রিস্টান পরিবারগুলি তাদের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে।

পোপ মহোদয়ের সাথে একাত্ম হয়ে আসুন আমরা নিবেদিত জীবনের জন্য প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

**কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও, সিএসসি**

**জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।**

## লেখা আহ্বান

**সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী ৫ মার্চ ভস্ম বুধবারের মধ্য দিয়ে তপস্যাকাল শুরু হচ্ছে। তাই তপস্যাকাল/প্রায়শ্চিত্তকালে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

এছাড়াও ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠাতে পারেন।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইল।

**লেখা পাঠাবার ঠিকানা**
**সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

## ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

## সাধারণকালের ৬ষ্ঠ রবিবার

**১ম পাঠ :** জেরেমিয়া ১৭:৫-৮
**২য় পাঠ:** ১ম করি. ১৫:১২-১৬-২০;
**মঙ্গলসমাচার:** লুক ৬:১৭, ২০-২৬

মঙ্গলসমাচারে প্রভু যিশুর অষ্টকল্যাণ বাণী শুনতে পেয়েছি। যিশুর বাণী জীবনদায়ী। তিনি তাঁর এই বাণী প্রেরিতশিষ্যদের এবং সমস্ত অঞ্চলের সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলেছেন। যিশুর অষ্টকল্যাণ বাণীতে অর্থাৎ যিশুর প্রদত্ত আইন/বিধান দিয়েছেন। যেমনটি মোশী সিনাই পাহাড় থেকে মনোনীত জাতিকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন। যিশুর এই অষ্টকল্যাণ বাণী আমাদের আহ্বান জানায় আমরা যেন অন্তরে দীন হয়ে উঠি। প্রভু যিশুর এই বাণী চিরন্তন। যা আমাদের চিন্তার জগতে নতুন চেতনা জাগায়। জীবনের সত্যিকারের লক্ষ্য নির্ধারণে তাগিদ দেয়। জীবনধারায় পরিবর্তন এনে দেয়। প্রভু যিশুর অষ্টকল্যাণ বাণীর মধ্য দিয়ে ধনী-সম্পদশালী, ক্ষুধার্ত, ঘৃণিত মানুষদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। আজকের ১ম পাঠ ও ২য় শাস্ত্র পাঠে একই ভাবে আহ্বান করা হচ্ছে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল জীবন যাপনের বিষয়ে। যিশুর পুনরুত্থান হলো আমাদের বিশ্বাসের জীবনের ভিত্তি।

মঙ্গলসমাচারে অষ্টকল্যাণ বাণী দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। অষ্টকল্যাণ বাণী অর্থাৎ আটটি বাণীর প্রথম চারটি বাণী হলো প্রথম ভাগ এবং এগুলোকে বলা হয় কল্যাণ বাণী এবং দ্বিতীয় ভাগে বাকি চারটি বাণী এবং এগুলোকে বলা হয় সর্তকতার বাণী। প্রথম চারটি বাণী দ্বারা যিশু আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান পাওয়ার জন্য কে যোগ্য বা কে অযোগ্য। একই সাথে যোগ্যতার ভিত্তি বা মানদণ্ড কিভাবে নির্ধারণ হবে সেই বিষয়ে বলা হয়েছে। অন্যদিকে চারটি সতর্কতার বাণী দিয়ে বোঝানো হয়েছে যারা আমোদ-প্রমোদে, বিলাসিতা, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, সামাজিক ন্যায্যতা ও মানুষের মর্যাদার বিষয়ে সর্তক করা হয়েছে।

প্রভু যিশুর অষ্টকল্যাণ বাণী, জীবনে সজীবতা এনে নতুনত্ব দান করে। অন্তরে যারা দরিদ্র বা দীন অর্থাৎ যারা ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আত্মনিয়োগ করে ও তাঁর উপর নির্ভর করে ঐশ রাজ্য পাবার অধিকার রাখে। যারা শোকার্ত অর্থাৎ নিজের পাপময়তা, মন্দতা, অপরাধের জন্য অনুতপ্ত, দুঃখিত তারা পরিতৃপ্ত হবে। যারা বিনয়ী অর্থাৎ নম্র, প্রতিশোধ পরায়ন নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে বাধ্য থাকা। ধার্মিকতার দাবী পূরণে তৃষিত ও ক্ষুধিত অর্থাৎ যাদের অন্তরে মানুষের জন্য ন্যায্যতা, ভ্রাতৃপ্রেম, ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তৃষিত। যারা দয়ালু অর্থাৎ অন্যেকে ক্ষমা করে, পরের দোষ নিয়ে সমালোচনা না করে, অন্যের মঙ্গল চিন্তা করা। নির্মল অন্তর অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যতা ও সরলতা ধারণ করা। মিলন স্থাপন করে অর্থাৎ শান্তি স্থাপন করা। ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশে প্রভু যিশুর অষ্টকল্যাণ বাণীর আলোকে প্রত্যেকে জীবন যাপন করি। কেননা প্রভু যিশুর বাণী জীবনদায়ী।


## কারিতাস বাংলাদেশ
## কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট
৬ (ছয়) মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

**ভর্তি বিজ্ঞপ্তি**

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত "মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রজেক্ট (MTTP)" এর ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন ট্রেডে আগামী এপ্রিল ২০২৫ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জরুরিভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

**১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা**

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি হতে এস.এস.সি (খ) বয়সসীমা: ছেলে/পুরুষ: ১৬-২২ বছর, মেয়ে/ নারী: ১৬ হতে ৩৫ বছর (বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), (গ) বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত/ অবিবাহিত (ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব নারী (ঙ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

**২। বাছাই পদ্ধতি :** লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা।

**৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য**

| | |
|---|---|
| যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় | (ক) অটো মেকানিক, (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন (চ) সুইং মেফশন অপারেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স (ছ) টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারি (জ) পোল্ট্রি রেয়ারিং এন্ড কাউ ফ্যাটেনিং (ঝ) বিউটিফিকেশন |
| কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস/ ৬ মাস, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, অনাবাসিক, ভর্তি ফি ১০০/- (একশত) টাকা, মাসিক টিউশন অঞ্চল অনুসারে নির্ধারিত। | |

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড সকলের (ছেলে/ মেয়ে / পুরুষ/ নারী) জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী ও যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে;

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ লিখিত দরখাস্ত; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব/ জাতীয় পরিচয়পত্র কপি; (ঙ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; (চ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্পের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা প্রদান; ( ছ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া।

৫। এলাকাভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগোযোগের ঠিকানা

| মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের ক্ষেত্রে যোগাযোগের ঠিকানা | | | |
|---|---|---|---|
| টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস বরিশাল অঞ্চল<br>সাগরদি, বরিশাল -৮২০০<br>ফোন: ০১৭১৯৯০৯৪৮৬ | টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস খুলনা অঞ্চল<br>রূপসাস্ট্যান্ড রোড, খুলনা-৯১০০<br>ফোন: ০১৭১৩২৫৭২৬০ | টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল<br>মহিষবাথান, রাজশাহী -৬০০০<br>ফোন: ০১৭২৩১৪৫৭০৬ | টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস ঢাকা অঞ্চল<br>১/সি, ১/ডি, পল্লবী, মিরপুর, সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬<br>ফোন:০১৯৫৫৫৯০৬৫৫ |
| টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল<br>১/ই,বায়েজিদ বোস্তামি রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ চট্টগ্রাম,<br>ফোন: ০১৯২১৮০৪০৮৩ | টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল<br>১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ ২২০০,<br>ফোন: ০১৬২৫১১৩১৭৫ | টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল<br>পশ্চিম শিবরামপুর, দিনাজপুর,<br>ফোন: ০১৭১২৫৬৭৩৪৪ | ইনচার্জ, সিটিএসপি<br>কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়<br>২, আউটার সার্কুলার রোড শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭<br>ফোন: +৮৮ ০২ ৪৮৩১৫৪০৬-৯ |

**কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান**

বিজ্ঞ/৪৯/২৫

# পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের বার্তা : বিশ্ব রোগী দিবস

## ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

"আশা হতাশ করে না" (রোমীয় ৫:৫),
কিন্তু পরীক্ষার সময়ে আমাদের শক্তিশালী করে।

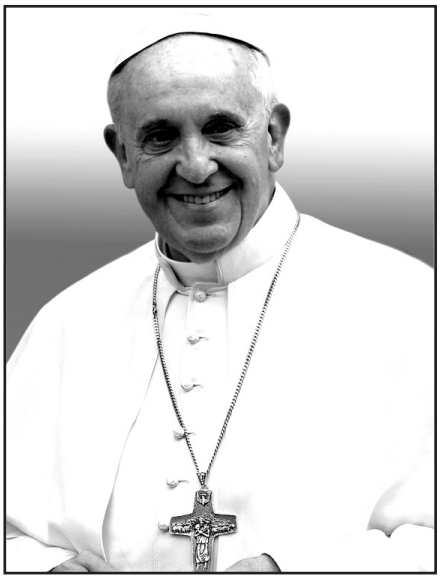

**প্রিয় ভাই ও বোনেরা,**

আমরা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলী বর্ষে ৩৩তম বিশ্ব রোগী দিবস উদ্‌যাপন করছি, যেখানে মণ্ডলী আমাদের "আশার তীর্থযাত্রী" হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সঙ্গে আছে এবং উৎসাহ প্রদান করছে, সাধু পলের কথায়: "আশা হতাশ করে না" *(রোমীয় ৫:৫);* প্রকৃতপক্ষে, এটি পরীক্ষার সময়ে আমাদের শক্তিশালী করে।

এগুলো হল সান্ত্বনাদায়ক বাক্য, তবে কিছু কিছু সময় তা বিভ্রান্তিকরও হতে পারে, বিশেষ করে যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের জন্য। আমরা কিভাবে শক্তিশালী হবো, উদাহরণস্বরূপ যখন আমাদের শরীর গুরুতর কোন রোগের শিকার হয় যার জন্য অনেক ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন যা হয়তো আমরা বহন করতে পারবো না, আমরা কিভাবে আশার আলো দেখতে পারি? যখন আমরা আমাদের নিজস্ব দুঃখ কষ্টের পাশাপাশি দেখি যে, আমাদের প্রিয়জনদের যারা আমাদের সাহায্য করে, তারাও আমাদের সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করে। তখন এই অবস্থায়, আমরা আমাদের নিজস্ব শক্তির চেয়েও বড় শক্তির প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের ঈশ্বরের সাহায্য প্রয়োজন, তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর করুণা এবং শক্তি যা পবিত্র আত্মার দান (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ১৮০৮)।

আসুন, আমরা এক মুহূর্ত থেমে চিন্তা করি কিভাবে ঈশ্বর সাক্ষাৎ, দান এবং সহভাগিতা এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে যারা বিশেষভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের কাছে থাকেন।

১. সাক্ষাৎ- যিশু যখন বাহাত্তর জন শিষ্যকে প্রেরণ কাজে পাঠিয়েছিলেন *(লুক ১০:১-৯)*, তখন তিনি তাদের অসুস্থদের কাছে ঘোষণা করতে বলেছিলেন: "ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের খুব কাছেই" (পদ ৯)। অন্য কথায়, তিনি তাদের বলেছিলেন, অসুস্থদের সাহায্য করতে, যেন তাদের দুর্বলতা, তা যতই বেদনাদায়ক এবং সহ্যের অতীত হোক না কেন, তারা যেন তা প্রভুর সাথে সাক্ষাতের এক সুযোগ হিসেবে দেখে। অসুস্থতার সময়, আমরা আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্তরে মানবিক দুর্বলতা অনুভব করি। তবুও আমরা ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সাহচার্য এবং করুণাও অনুভব করি, যিনি যিশুর মাধ্যমে আমাদের মানবিক দুঃখ-কষ্টে অংশীদার হয়েছিলেন। ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করেন না এবং প্রায়ই আমাদের এমন এক শক্তি প্রদান করে আমাদের অবাক করে দেন যা আমরা কখনও আশা করিনি এবং আমাদের নিজেরাই কখনও পেতে পারতাম না।

সুতরাং অসুস্থতা হল একটি রূপান্তরকারী সাক্ষাতের উপলক্ষ্য, একটি শক্ত পাথরের আবিষ্কার যাকে আমরা জীবনের ঝড়ের মধ্যেও শক্ত করে ধরে রাখতে পারি, একটি অভিজ্ঞতা যা, অনেক মূল্য দিয়ে হলেও, আমাদের সকলকে আরও শক্তিশালী করে তোলে কারণ এটি আমাদের শেখায় যে, আমরা একা নই। দুঃখ-কষ্ট সর্বদা পরিত্রাণের একটি রহস্যময় প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে, কারণ এটি আমাদের ঈশ্বরের সাহচার্য এবং সান্ত্বনাদায়ক বাস্তব উপস্থিতি অনুভব করায়। এইভাবে, আমরা জানতে পারি "সুসমাচারের পূর্ণতা তার সমস্ত প্রতিশ্রুতিসহ এবং জীবন" (সাধু জন পল ২য়, যুবাদের উদ্দেশে ভাষণ, নিউ অরলিন্স, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭)।

২. এটি আমাদের দ্বিতীয় উপায়ে নিয়ে আসে যে ঈশ্বর দুঃখ-কষ্টভোগীদের সাথে থাকেন: উপহার হিসাবে। অন্য যে কোনো কিছুর চেয়েও বেশি দুঃখ-কষ্ট আমাদের সচেতন করে দেয় যে, আশা প্রভুর কাছ থেকে আসে। তাই, প্রথমত, এটি একটি উপহার যা গ্রহণ করতে হবে এবং বপন করতে হবে, "ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার প্রতি বিশ্বস্ত" থাকার মাধ্যমে, ম্যাডেলিন ডেলব্রেলের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি (cf. La speranza è una luce nella nottecf. La speranza è una luce nella notte, Vatican City 2024, Preface)।

প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মধ্যেই আমাদের জীবন এবং ভাগ্য অনন্তকালের অসীম দিগন্তে তার স্থান খুঁজে পায়। কেবল মাত্র যিশুর পুনরুত্থানের রহস্যেই আমরা এই নিশ্চয়তা অর্জন করতে পারি যে, "মৃত্যুও নয়, জীবনও নয়, স্বর্গদূতও নয়, শাসকও নয়, বর্তমান, ভবিষ্যতের জিনিসও নয়, শক্তি, উচ্চতা, গভীরতা, সমস্ত সৃষ্টির অন্য কোনও কিছুই আমাদের ঈশ্বরের প্রেম থেকে আলাদা করতে সক্ষম হবে না" *(রোমীয় ৮:৩৮-৩৯)*। এই "মহান আশা" হল সেই সমস্ত ছোট ছোট আলোর উৎস যা আমাদের জীবনের পরীক্ষা এবং সমস্যাগুলোর মধ্যেও আমাদের পথ দেখতে সাহায্য করে (ষোড়শ বেনেডিক্ট, Spe Salvi ২৭, ৩১)। পুনরুত্থিত প্রভু আমাদের যাত্রা পথের সঙ্গী হিসেবে আমাদের সাথে সাথে পথ হেঁটে যান যতদূর যাওয়া সম্ভব, ঠিক যেমন তিনি শিষ্যদের সাথে ইম্মায়ুসের পথে গিয়েছিলেন *(লুক ২৪:১৩-৫৩)*। তাদের মতো, আমরাও তাঁর সাথে আমাদের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং হতাশা সহভাগিতা করতে পারি এবং তাঁর কথা শুনতে পারি, যা আমাদের আলোকিত করে এবং আমাদের হৃদয়কে উষ্ণতা দান করে। তাদের মতো, আমরাও রুটি ভাঙার সময় তাঁর উপস্থিতি চিনতে পারি এবং এইভাবে, এমনকি বর্তমানেও, আমরা অনুভব করতে পারি যে, সেই কঠিন বাস্তবতা"। আমাদের কাছে আমাদের সাহস এবং আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করছে।

৩. আমরা এখন ঈশ্বরের আমাদের নিকটবর্তী হওয়ার তৃতীয় উপায়ে আসি: সহভাগিতার মাধ্যমে। দুঃখ-কষ্টের স্থানগুলো প্রায়ই সহভাগিতার এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধির স্থানও। অনেকবার, অসুস্থদের বিছানার পাশে, আমরা আশা করতে শিখি! অনেকবার, যারা কষ্টভোগ করে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে, আমরা বিশ্বাস রাখতে শিখি! কতবার, যখন আমরা অভাবীদের যত্ন নিই, তখন আমরা ভালোবাসা আবিষ্কার করি! আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা সবাই: রোগী, চিকিৎসক, নার্স, পরিবারের সদস্য, বন্ধু, পুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতধারী পুরুষ এবং মহিলা, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, পরিবারে হোক বা ক্লিনিক, নার্সিং হোম, হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রে আমরা আশার "দূত" এবং একে অপরের জন্য ঈশ্বরের বার্তাবাহক।

এই আনন্দময় সাক্ষাতের সৌন্দর্য এবং তাৎপর্য আমাদের উপলব্ধি করতে শিখতে হবে। আমাদের একজন নার্সের মৃদু হাসি, একজন রোগীর কৃতজ্ঞতা এবং আস্থা, একজন ডাক্তার বা স্বেচ্ছাসেবকের যত্নশীল মুখ, অথবা একজন স্ত্রী, একজন সন্তান, একজন নাতি-নাতনি বা প্রিয় বন্ধুর উদ্বিগ্ন এবং প্রত্যাশিত চেহারা লালন করতে শেখা উচিত। এগুলো সবই এক একটি আলোকরশ্মি যা মূল্যবান; এমনকি অন্ধকার প্রতিকূলতার রাতের মধ্যেও আমাদের শক্তি দেয়, একই সাথে জীবনের গভীর অর্থ শেখায়, ভালোবাসা এবং ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে *(লুক ১০:২৫-৩৭)*।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যারা অসুস্থ অথবা যারা দুঃখকষ্ট ভোগীদের যত্ন নেন, এই জয়ন্তীতে আপনারা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আপনাদের একসাথে যাত্রা সকলের জন্য একটি চিহ্ন: 'মানব মর্যাদার মহিমা, আশার গান' (Spes Non Confundit, 11)। এর সুরগুলো স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের বাইরেও যেন শোনা যায় এবং "দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে" যেখানে প্রয়োজন সেখানে এমন একটি আলো ও সান্ত্বনার পরিবেশ আনা সম্ভব যা অর্জন করা অনেক সময়ই কঠিন মনে হয়। সেই কারণেই এটি এত সান্ত্বনাদায়ক এবং শক্তিশালী।

পুরো মণ্ডলী আপনাদেরকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে! আমিও জানাচ্ছি, এবং আমি সর্বদা আমার প্রার্থনায় আপনাদেরকে স্মরণ করছি। আমি আপনাকে, আপনাদেরকে আমাদের মা মারীয়া, রোগীদের স্বাস্থ্যের কাছে অর্পণ করি, যে কথাগুলো দ্বারা আমাদের অনেক ভাইবোন তাদের প্রয়োজনের সময় তাকে সম্বোধন করেছেন:

আমরা আপনার সুরক্ষার জন্য ছুটে যাই, হে ঈশ্বরের পবিত্রা জননী।
আমাদের প্রয়োজনে আমাদের আবেদনগুলোকে তুচ্ছ করো না,
কিন্তু আমাদের সর্বদা সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করো, হে মহিমান্বিত এবং ধন্যা কুমারী।

আমি আপনাদেরকে, পরিবার এবং প্রিয়জনদেরসহ আশীর্বাদ করি, এবং আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে, আমার জন্য প্রার্থনা করতে ভুলবেন না।

**রোম, সাধু জন ল্যাটেরান, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫**

**+ ফ্রান্সিস**

***ভাষান্তর :*** *ফাদার থাদিউস হেমব্রম, সিএসসি*

# অনন্ত যাত্রায় আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবার ৩৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী

**প্রয়াত প্যাট্রিক গমেজ**
**জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ**
**মৃত্যু : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ**
**রাজনগর, রাঙ্গামাটিয়া**

*মহাঘুমে জাগনী এখনো বাবা*
*তোমার শূন্যতা খুঁজি মোরা,*
*দিনক্ষণ প্রতিটি মোড়ে*
*ব্যথায় অন্তর কেঁদে মরে ॥*
*সুখের দিনে তুমি নেই*
*কত কষ্ট করেছ জানিনে,*
*বিশ্বাস তুমি আছ উর্ধ্বে*
*স্বর্গরাজ্যে পিতার স্থানে ॥*

***প্রিয় বাবা,***

সময়ের স্রোতধারায় ৩৩টি বছর মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর চির আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। আবারও ফিরে এলো বেদনা বিধুর সেই ১৮ ফেব্রুয়ারি, যেদিন তুমি আমাদের শূন্য করে, কাঁদিয়ে চলে গেলে পরম পিতার কাছে। বাবা তুমি নেই, মাকে নিয়ে আমরা পাঁচ ভাই-বোন আমাদের সংসার নিয়ে এগিয়ে চলছি।

স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জীবনাদর্শ ও দিক নির্দেশনাকে সামনে রেখে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে পারি।

করুণাময় সৃষ্টিকর্তা পিতা ও স্নেহময়ী মায়ের কাছে আমাদের সকলের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে চিরশান্তি দান করেন।

***পরিবারের পক্ষে***
***স্ত্রী : ছবি গমেজ***

বিজ্ঞ/৫০/২৫

# “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও আমাদের করণীয়”

**ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি**

প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট ভাষা আছে যার মাধ্যমে ঐ জাতি নিজেদের ভাব প্রকাশ করে থাকে। ভাব প্রকাশের মাধ্যম রূপে একটি জাতি সমন্বিতভাবে যে ভাষা ব্যবহার করে তাকে মাতৃভাষা বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, শিশু জন্মের পর মায়ের মুখ থেকে যে ভাষায় কথা বলতে শেখে ও মনের ভাব প্রকাশ করে তাকেই মাতৃভাষা বলে। মাতৃ ভাষার মাধ্যমেই একটি জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে থাকে। তাই মাতৃভাষা যে কোন জাতির জন্যে একটি অপরিহার্য প্রকাশ মাধ্যম। এ মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। বাঙালি জাতি মায়ের ভাষাকে রক্ষার জন্যে রক্ত দিয়ে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য ইতিহাস। বাংলার দামাল ছেলেরা তাজা রক্তের বিনিময়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি ছিনিয়ে আনে মাতৃভাষার অধিকার। প্রতিষ্ঠা পায় বাংলা ভাষা। সে আত্মত্যাগের ফলে মহান একুশ এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বায়ান্নর অর্জন আরও তাৎপর্য লাভ করেছে এবং আরও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে জাতিসংঘের এ স্বীকৃতির মাধ্যমে।

**মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি:** ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের আগে থেকেই বাংলা ভাষা লড়াইয়ে নামতে হয় উর্দু প্রতিপক্ষ হিসেবে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদই প্রথম বাংলাকে উর্দুর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ভারতে যেমন হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানেও তেমনিই উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছিল এবং বাংলার জ্ঞান তাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দৈনিক আজাদে এক প্রবন্ধে বলেন, “অধিকাংশ জনসংখ্যার ভাষা হিসেবে বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত”। বস্তুত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেখা যায় পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের মানুষেরই মাতৃ ভাষা উর্দু নয়। পাকিস্তান জন্মের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে করাচি শিক্ষা সম্মেলনের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার একটি প্রস্তাব পাশ করে নেওয়া হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূর প্রসারী। সে বছর ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার রাজপথে তৎকালীন পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত লাগাতার সংগ্রামের ফসল হিসেবে পূর্ববাংলার তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ছাত্রদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদার প্রশ্নটি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১ মার্চ রেসকোর্সের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উর্দূকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও জনতার মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দীন মুসলিমলীগের এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, “একমাত্র উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা”। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল বাঙালি। পূর্ব বাংলায় শুরু হয়েছিল মহান ভাষা আন্দোলন। সে বছর একুশে ফেব্রুয়ারি বুকের রক্ত দিয়ে ছাত্রসমাজ তাদের মানসের চেতনার পরিপক্কতা দেখে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো যে চেতনায় প্রস্তাবনা পাস করেছে, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ভাষা সংগ্রামীরা সেই প্রেরণাকেই নাগরিকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। আর এটা হলো সকল মাতৃ ভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতি।

**অমর একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও তাৎপর্য:** বাঙালির ইতিহাসে অসংখ্য উজ্জ্বল মাইলফলক আছে যা অর্জনের সমৃদ্ধতায় উজ্জ্বল। এমনই একটি মাইলফলক যা নিঃসন্দেহে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি বাঙালির জন্য এক উজ্জ্বল মাইফলক। এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ৪ হাজারের উপর ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অমর একুশের মধ্যে নিহিত ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্রে বীজ। সুতরাং অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাঙালির প্রতীকী বিজয় নির্দেশ হয়েছে। ভাষা শহিদের আত্মদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেছে। ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অমর একুশে এখন বিশ্বে তাৎপর্যমণ্ডিত প্রতীক, যা বাঙালির গর্ব আর অহংকারের দ্যোতক। ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ বাঙালি জাতির জন্যে এক বিরাট গৌরব। সারা বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশ নামে একটি দেশের কথা, বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার কথা জানতে পারছে। ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে থাকবে। এ দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে বিশিষ্ট ভাষা বিজ্ঞানী হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, “আমি মুগ্ধ, আমি প্রীত, আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, আমার প্রাণের কথা, আমার ভাষায় জানতে পারব, বলে আমার হৃদয় স্পন্দন বেড়েছে, সত্যি গর্বিত আমি”।

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম আনন্দ উৎসব:** মহান ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পাওয়ায় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর উৎসবের ঘোষণা দেয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে এ উৎসবটি পালিত হয়। দিনভর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আয়োজিত হয় আনন্দ শোভাযাত্রা, “একুশ আমাদের অহংকার, একুশ পৃথিবীর অলংকার” ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত ছিল চারিদিক। আলোচনা সভা, আবৃত্তি, নাচ, গান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয় এ অনুষ্ঠানে। এ উৎসব ছিল আমাদের গৌরবের এবং জয়ের মেলা। বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ও ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস হিসেবে মর্যাদা লাভ করায় বাংলা ভাষা শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে সারাদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছুটে যায় শহিদ মিনারে। আজ আমরা গর্ব করে বলতে পারি বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে দ্বিধা করেনি। বিশ্ববাসী স্বীকৃতি দিয়েছে আমাদের মাতৃভাষাকে। জাতিসংঘের মহাসচিব এ দিনটি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে বিশ্ববাসী তাদের জাতিসত্তার প্রধান বিবেচ্য বিষয় মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। প্রতাপশালী অন্য ভাষার গ্রাম থেকে প্রতিটি জাতি নিজ নিজ মাতৃ ভাষাকে রক্ষার জন্যে প্রতীক হয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মর্যাদা অপরিসীম। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংস্কৃতির সেতুবন্ধন। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসটিকে বিশ্বের প্রায় ১৮৮টি দেশে পালন করা হয়। ফলে তারা বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য সভ্যতায় আগ্রহী

হচ্ছে। বাংলার বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের সৃষ্টি সম্পর্কে জানছে। বিশ্বের দরবারে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। বিশ্ব জানতে পারছে যে, বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্যে লড়াই করে গৌরবের উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মে দিবসে বিশ্ববাসী যেমন শিকাগোর শ্রমিক আন্দোলকে স্মরণ করে, তেমনিভাবে এ দিনে বিশ্ব বাংলার ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। ফলে আমাদের মাতৃভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও

সভ্যতার সঙ্গে বিশ্ববাসীর সেতুবন্ধন তৈরি হচ্ছে।

এত সংগ্রাম এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রাণের মাতৃভাষা দিবস। এই দিনটি শুধুমাত্র উৎসবের মধ্যে একুশকে সীমাবদ্ধ করে রাখা মোটেই আমাদের কাম্য হতে পারে না। একুশ আমাদের যে শিক্ষা ও উপলব্ধি দান করে তা আমাদের জীবনে দীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। একুশ হবে আমাদের কর্মচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা। ২১ এর সত্যিকার ইতিহাস আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। একই সাথে বাংলা ভাষার বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানোর জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। যে লক্ষ্যে আমাদের দেশের মেধাবী ও দামাল ছাত্ররা জীবন দিয়ে গেছে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে। কেবল বাংলা ভাষাকে নয়, পৃথিবীর সকল ভাষার নিজস্ব মহিমা অক্ষুন্ন রাখার দীপ্ত শপথ নেবার দিন হচ্ছে একুশ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাঙালি হিসেবে আজ আমাদের সবার অঙ্গীকার সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার। প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "মা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা এই তিনটি জিনিস সবার কাছে পরম শ্রদ্ধার বিষয়। মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ প্রকাশ করে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি"। মাতৃভাষাই মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে তৃপ্তি ও পরিপূর্ণতা দান করে। জাতীয় জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে হলে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প হতে পারে না। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশে মাতৃভাষা হচ্ছে প্রধান মাধ্যম। কবির রামনিধি গুপ্তের ভাষায়, "নানান দেশের নানান ভাষা, বিনা স্বদেশি ভাষা মিটে কি আশা"।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে জাতিসংঘের বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো মাতৃভাষাগুলোর অধিকার এবং একে মর্যাদাপূর্ণভাবে টিকিয়ে রাখতে যে অনন্য সাধারণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা সমগ্র বিশ্বের ভাষা প্রবাহে অসামান্য অবদান রাখবে। একই সঙ্গে এই দিন বিশ্বের বৃহৎ ভাষাগুলোর পাশে ক্ষুদ্র নিপীড়িত, অবহেলিত ভাষাগুলোরও সংঘবদ্ধভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা খুঁজে পাবে। আজ তাই বাঙালি জাতি তার মাতৃভাষা এবং বিশ্বের অন্যান্য ভাষার প্রতি এ জাতির দায়িত্ব শতগুণে বেড়ে গেল। আমাদের সকলের প্রত্যাশা ও শুভকামনা। "একুশ আমার চেতনা, একুশ আমার গর্ব"।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার:** [মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি(সেলিম হোসেন), একুশের গল্প(হৃদয় হাসান), ভাষা আন্দোলনের কিশোর ইতিহাস (এমরান চৌধুরী), যুদ্ধ জয়ের গল্প(আলী আসকর), ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট]।

## ভাষা শহীদদের স্মরণে

জেসিকা লরেটো ডি'রোজারিও

স্বাধীন বাংলা, যদি হয় পরাধীন
আসে শাসক, শোষক
জানবে পৃথিবী আরও একবার
একুশে নয় কারও পৃষ্ঠপোষক!
যেমনি করে এসেছিলো ৭১,
এসেছিলো ২১ ফেব্রুয়ারি
এই দেশ, এই ভূমির তরে
প্রাণও বাজি রাখতে পারি।
কত মায়ের বুক হয়েছে খালি!
রাজপথে লেগেছে রক্ত লাল,
এই মাটি ভুলবে না কখনো
ভাষা শহীদদের আত্মদান!
এই বাংলায় মিশেছে রক্ত
ভাষাশহীদদের গন্ধে,
বিদ্রোহ হবে যুগ যুগান্তরে
ভাষার, স্বাধীনতার জন্য।
আসুক ফিরে একাত্তর, নামুক
বাংলায় স্বাধীনতার ঢল,
দেখুক বিশ্ব হতবাক হয়ে
বাংলায় জন্মে বীরের দল!


## বিদায়ের ১৮তম মৃত্যু বার্ষিকী

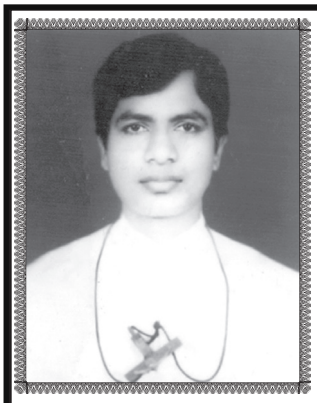

**প্রয়াত ফাদার বিমল রোজারিও**
জন্ম: ৫/১২/১৯৫৭
মৃত্যু: ৮/২/২০০৭
চড়াখোলা (উত্তরপাড়া) তুমিলিয়া

**প্রিয় ফাদার কাকা,**

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে তুমি এসেছিলে ক্ষণজন্মা হয়ে। এ ক্ষণজন্মা হয়েও তুমি এ ধরণীতে প্রভুর জন্যে ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করে জীবনটা উৎসর্গ করেছিলে। তোমার মত ব্রতীয় জীবনে পিসিরাও যে তাদের জীবন প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন, তোমার না থাকার নিয়ে। আর আমরা বাড়িতে তোমার স্বর্গরাজ্যে চলে যাবার স্মৃতি নিয়ে বয়ে চলেছি শোক বেদনায়। তোমার মত বাবাও যে স্বর্গবাসী।

আমরা তোমাকে আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তোমার আদরের কথা, তোমার মিষ্টি হাসিমাখা ভালবাসার কথা। তুমি আমাদের জন্যে আশীর্বাদ কর যেন তোমার আদর্শ নিয়ে মা ও পিসিদের নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি।

**শোকার্তচিত্তে**
**তোমার স্বজনরা**

বিজ্ঞ/৫১/২৫

# একুশের মূল ভাবনা

## সুনীল পেরেরা

**ভূমিকা:** হাজার বছরের পরিক্রমায় এক পর্যায়ে এই প্রাচীন বঙ্গভূমির নাম হয়েছে বাংলাদেশ। এর অধিবাসীরা হলেন বাঙালি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ হলে এ অঞ্চলে অন্যরকম এক জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়েছিল। এটাই হলো ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের 'বঙ্গভঙ্গ'। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ তাদের সতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে ভাবনায় পড়ে যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত ভাগের আগে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লিতে মুসলিম লীগের এক কনভেনশনে 'এক পাকিস্তানের' পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ভণ্ডুল হয়ে যায়। বাংলার নেতারা তখন পাকিস্তানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগষ্ট সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম হলো পাকিস্তানের। আমরা হলাম পূর্ব পাকিস্তানে অধিবাসী।

জন্মলগ্নেই এই কৃত্রিম অস্বাভাবিক রাষ্ট্রটির মৃত্যু ঘন্টা বেজেছিল যখন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান আইনসভার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবী জানিয়েছিলেন। কারণ বাংলা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের দাবির ভেতরে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতা ও ভারতের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে তাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিল। ধর্মভিত্তিক কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সম্পর্কে বাঙালির মোহভঙ্গ হতে সময় লেগেছিল মাত্র সাত মাস। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঢাকা সফরে আসেন, তখন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে একুশে ফেব্রুয়ারিতে তার চূড়ান্ত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি রফিক, জব্বার ও বরকত, সালামসহ অগণিত ভাষাশহীদের আত্মদানে। এই ভাষা আন্দোলনের ভূমিতে বেড়ে উঠেছে নব আঙ্গিকে বাঙালি জাতীয়বাদ। বাঙালিত্বের পরিচয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠলেও অচিরেই বাংলার রাজনীতিও এই চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়। বাঙালিত্বের চেতনা মূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে, গানে গানে। তার গান 'আমার সোনার বাংলা', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'স্বার্থক জনম আমার' প্রভৃতি গানে বাঙালি জাতীয়বাদী চেতনা নানারূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল এই অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়বাদ।

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা ছিনিয়ে আনতে শিখেছি আমাদের ন্যায্য অধিকার। পেয়েছি মুক্তির পথ, একাত্তরে এনেছি স্বাধীনতা। মাতৃভাষার জন্য আত্মদান পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। ফলে পৃথিবীর মধ্যে বাংলাভাষা একুশেতে পেলো রক্তাক্ত স্বীকৃতি। আমাদের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি রচিত হয়েছিল বাহান্নর সেই উত্তাল দিনে।

একুশ আমাদের মায়ের ভাষা, গানের ভাষা, প্রাণের ভাষা। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বের ১৭৭টি দেশের সর্বসম্মতিক্রমে ইউনেস্কো ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেদিনের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, "১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে মাতৃভাষার জন্য অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং সেদিন যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশে দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করা হচ্ছে।" একুশ আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা দিয়েছে। মাতৃভাষার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতিই পেয়েছে বাঙালি। এতে আমরা গৌরবান্বিত হয়েছি। এ গৌরব রক্ষার সুমহান দায়িত্ব আমাদের সবার। শুধু মুখে নয় কাজেও তা প্রমাণ করতে হবে। এখনো পাঠ্য পুস্তকে বানান ভুল, লেখায়, বলায়, সর্বত্রই ভুলের ছড়াছড়ি। বাংলার প্রতি অনেকেরই অনীহা। সারাবিশ্বের ১৯১টি দেশে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস।

বাংলাদেশে অনেক আদিবাসী রয়েছেন যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। এগুলোকেও আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রত্যেককে যার যার ভাষা-সংস্কৃতি লালন-পালন ও চর্চার সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের ভাষা চর্চা ও বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিটি আদিবাসী শিক্ষালয়ে, প্রতিষ্ঠানে, উৎসবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। তাই তাদেরও মাতৃভাষা চর্চার স্বাধীনতা দিতে হবে।

বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে উন্নত এবং সমাদৃত। পৃথিবীর একটি দেশও পাওয়া যাবে না যে, দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই বাংলা ভাষায় কথা বলে। বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে একমাত্র মাতৃ ভাষার জন্যই। বিদেশী ভাষা যতই শিখি না কেন-মাতৃভাষার কথা না বললে প্রাণ ভরে না। (মহান ২১ ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশের জন্য গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস যা যুগে যুগে জাতিকে প্রেরণাদীপ্ত করে চলেছে) ভাষা আন্দোলনে নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত সকল ভাষা শহীদদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর কৃতজ্ঞতা ও হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

*১১ পৃষ্ঠার বাকি অংশ*

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহ্যগত শিল্পকলা, নৃত্য, সঙ্গীত, পোশাক-পরিচ্ছদ, এবং জীবনযাত্রার ধরনও ভাষার সাথে সম্পর্কিত, তাই এসবের অবহেলা, দেশের ঐতিহ্যকে অবহেলারই সামিল। একইভাবে, জাতি হিসেবে আমাদের উচিত দেশের সকল জাতিগত গোষ্ঠী, বিশেষ করে আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার সংগ্রামের প্রতীক নয়, এটি আদিবাসী জনগণের ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার প্রতীকও। সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় পর্যায়ে এই ভাষাগুলির মর্যাদা ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এখনই। প্রথমত, আদিবাসী ভাষাগুলি শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে নতুন প্রজন্ম এসব ভাষা শিখতে পারে এবং তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে অবদান রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত, আদিবাসীদের ভাষা এবং সংস্কৃতি প্রচারের জন্য বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা উচিত। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসব ভাষার জন্য বিশেষ মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত, যাতে এসব ভাষা শিখতে এবং ব্যবহার করতে আগ্রহীদের সংখ্যা বাড়ে।

পরিশেষে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের চেতনা জাগ্রত হোক সকলের মাঝে। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রাম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সংগ্রাম হয়ে দাঁড়াক, যেন ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের পাশাপাশি ঐতিহ্য রক্ষা করতে সকলে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং উন্নত সমাজে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মর্যাদার সাথে তুলে ধরতে পারে। একুশে ফেব্রুয়ারি অনবরত প্রেরণা যোগায় ও আহ্বান করে সকলকে তাদের নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় ব্রতী হতে।

# একুশে ফেব্রুয়ারি : আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় প্রেরণা

## জাসিন্তা আরেং

একুশে ফেব্রুয়ারি, মাতৃভাষা আন্দোলনের অবিস্মরণীয় একটি দিন। দিনটি বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে, বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঢাকার রাজপথে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন অগণিত ছাত্র-জনতা। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে এবং পরবর্তীতে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। তবে, একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব শুধু বাংলাভাষীদের কাছেই নয়, এটি দেশের বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামের প্রতীকও। বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এখন বিপন্ন এবং অনেক সময় অস্তিত্বের লড়াইও করতে হচ্ছে। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষীসহ সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য একটি বৃহত্তর বার্তা প্রদান করে যে, ভাষা আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা রক্ষায় অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। দিবসটি আদিবাসী জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণা এবং পথ দেখানো রক্তিম শিখা। বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আদিবাসীদের জীবনধারার মূল ভিত্তি। একুশে ফেব্রুয়ারি আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় প্রেরণার মশাল হিসেবে গণ্য।

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের বিভিন্ন ভাষার প্রচলন রয়েছে, যেমন- চাকমা, মারমা, গারো, সাঁওতালি, মারমা, কুচই, ত্রিপুরা, খাসিয়া ইত্যাদি। এই ভাষাগুলি কেবল তাদের যোগাযোগের মাধ্যমই নয়, বরং তাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, ইতিহাস, চেতনা এবং সামাজিক সংহতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভাষা তাদের অস্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে এবং এটি তাদের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তবে, দেশের কেন্দ্রীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার আধিপত্য এবং দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও সরকারি ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার প্রাধান্যতার কারণে আদিবাসীদের ভাষাগুলো এখন বিপন্নপ্রায়। আদিবাসীদের অনেক ভাষাই আজ বিলুপ্তির পথে এবং তা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতির কারণও। একুশে ফেব্রুয়ারি আদিবাসী ভাষার সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম ও প্রেরণা।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভাষার অধিকার একেবারে মৌলিক মানবাধিকার। এটি কেবল ভাষা রক্ষা করার জন্য একটি সংগ্রাম নয় বরং জনগণের সাংস্কৃতিক অধিকার, ঐতিহ্য এবং অস্তিত্ব রক্ষারও সংগ্রাম। আদিবাসী জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারও তেমনি মৌলিক। রাষ্ট্র ও সমাজকেও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে এসে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তা সংরক্ষণে সহায়তা করতে হবে। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা প্রতি বছর মনে করিয়ে দেয় যে, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য নয়, বরং সকল সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পরিচয় রক্ষা করার জন্যও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আদিবাসী জনগণের ভাষা শুধু তাদের যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের গানে, কবিতায়, আচার-অনুষ্ঠানে এবং জীবনধারায় ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা তাদের অস্তিত্বের সাক্ষী এবং একে রক্ষা করা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব অধিকার নয়, বরং দেশের বহুজাতিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল বাংলাভাষীদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন নয়, বরং এটি সকল ভাষাভাষী মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের প্রতীক। এই দিনটি আদিবাসী জনগণের ভাষা রক্ষার জন্যও একটি শক্তিশালী প্রেরণা হতে পারে। আমরা যদি একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আদিবাসী ভাষাগুলোর সংরক্ষণে উদ্যোগী হই, তবে আমাদের জাতিগত বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রেখে আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করতে পারবো।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষাকে একমাত্র অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা আদিবাসীদের ভাষার জন্য একটি বড় বাঁধা। সরকারি প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার একচেটিয়া আধিপত্য আদিবাসী জনগণের ভাষার প্রচলন এবং ব্যবহারকে মারাত্মকভাবে বাঁধাগ্রস্ত করে। আদিবাসী জনগণের ভাষা স্বল্প পরিসরে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও যথাযথ চর্চার অভাবে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি হারাতে বসেছে। এছাড়াও, আধুনিক সমাজের পরিবর্তন এবং মূলধারার সংস্কৃতির প্রভাবের কারণেও এসব ঐতিহ্য এবং ভাষা ক্রমেই বিলুপ্তির পথে। একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার পাশাপাশি আদিবাসীদের ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা বাংলাদেশের শক্তিস্বরূপ। একুশে ফেব্রুয়ারি আদিবাসীদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক বহুত্বের মর্যাদা রক্ষারই অংশ।

আদিবাসী ভাষা রক্ষা করা শুধু রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়, সমাজের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলব্ধি শেখায় যে, নিজস্ব ভাষা রক্ষা করতে হলে প্রতিবাদ, সংগ্রাম, এবং একাত্মতার প্রয়োজন। আমাদের সকলের উচিত, আদিবাসী ভাষার সংরক্ষণ ও মর্যাদা লাভে উদ্যোগী হওয়া, যাতে এই বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলি একেবারে হারিয়ে না যায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যেন তা সগৌরবে তাদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। আদিবাসী ভাষাগুলি আমাদের জাতিগত ঐতিহ্যের অংশ ও দেশের সম্পদ এবং এদের রক্ষার্থে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকারের কর্তব্য।

আদিবাসী ভাষার সংরক্ষণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জরুরি। প্রথমত, আদিবাসী ভাষাগুলি শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রত্যেকটি ভাষা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হলে, তা ভাষাভাষীদের মধ্যে চর্চিত হতে থাকবে এবং তরুণ প্রজন্মও তাদের ভাষার প্রতি আগ্রহী হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আদিবাসী ভাষার সাংস্কৃতিক মূল্য তুলে ধরতে জাতীয় পর্যায়ে নানা অনুষ্ঠান এবং প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তৃতীয়ত, মিডিয়া এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এসব ভাষার ব্যবহার করা উচিত, যেন ভাষাগুলি আধুনিক যুগের সঙ্গে খাপ খায় এবং টেকসই হয়ে ওঠে। এছাড়া, আদিবাসী ভাষার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক আদিবাসীদেরও সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একুশে ফেব্রুয়ারির মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসগুলোতে এই ভাষাগুলোর প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরেই তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। একুশে ফেব্রুয়ারি দিবসটি তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য। আদিবাসীদের বহু বছরের

*বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায় পড়ুন...*

# অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী

**ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ**

খ্রিস্টমণ্ডলীতে স্বীকৃত সাধুদের মধ্যে অল্প সংখ্যক সাধুই আছেন যারা পাদুয়ার সাধু আন্তনীর চেয়ে অধিক পরিচিত। সাধু আন্তনী তার সুস্বাস্থ্য, সুঠাম দেহ, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, বাগ্মিতা, কথা বলার বাচনভঙ্গি, গভীর ধর্মীয় জ্ঞান এবং আশ্চর্য ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সাধু আন্তনী তাঁর উপদেশের জন্য সর্বত্রই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর জিহ্বা এমনই ধন্য যে মৃত্যুর পরও তা অক্ষত রয়ে গেছে। আজ প্রায় নয়শত বছর পরও এই অসাধারণ ঐশবাণী প্রচারকের জিহ্বা মানুষকে আকর্ষণ করে, নিয়ে যায় পাদুয়ার পুণ্য ভূমিতে। এই মহান সাধু তাঁর জীবনদশায় যেমন অনেক অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন, তেমনি মৃত্যুর পরও যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে তারাই আশ্চর্য ফল লাভ করেছে। তাঁর শত আশ্চর্য কাজের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক উপস্থাপন করা হল–

১। **'যেখানে তোমার ধন, সেখানে তোমার মন':** তেরশ শতাব্দীতে সুদ নেওয়া একটা লাভজনক ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। সেই সময়ে আন্তনী এই ধরনের অন্যায়ভাবে সুদগ্রহণের বিরুদ্ধে বেশ সোচ্চার ছিলেন। এমননি এক সময়ে একজন সুদখোর মারা যায়। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগে সাধু আন্তনী বলেছিলেন এই লোকটা সারা জীবন অন্যায়ভাবে মানুষের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করেছে তাই তার হৃদয় বলতে কিছু নাই। এমনকি এখনও যদি তার বুক চিড়ে দেখা হয়, দেখা যাবে সেখানে শুধু সুদের টাকা রয়েছে, হৃদয় নয়। কিছু সংখ্যক লোক আন্তনীর কথার সত্যতা প্রমাণ করতে চেয়ে লোকটার বুক চিড়ে ফেলল। আর আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে বুকের পাঁজরের নিচে সত্যিই হৃদয় বলে কিছু ছিল না। পাঁজরের হাড় দিয়ে জড়ানো টাকার বাক্স।

২। **করে মন পরিবর্তন, দীক্ষা নিয়ে হলেন আন্তনী ভক্ত:** এজেলিনো দ্যা রোমানো, যিনি রোম সম্রাটের হয়ে কাজ করতো এবং পোপের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। তিনি পোপ পন্থীদের ঘিরে রেখেছিলেন এবং কিছুতেই মুক্তি দিতে রাজি ছিলেন না আর বার বার হত্যা করার হুমকি দিচ্ছিলেন। সাধু আন্তনী তার মনপরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করলেন। তার সামনে দাঁড়ালেন এবং আহ্বান করলেন যেন, সে মন পরিবর্তন করে আর লোকদের ছেড়ে দেয়। আন্তনীর আহ্বানে সে সঙ্গে সঙ্গে মনপরিবর্তন করল, পোপের অধীনতা গ্রহণ করল এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন।

৩। **মাছেরাও দেখছি এর কথা শোনে:** সাধু আন্তনী ইতালির রিমিনি শহরে গেলেন ভ্রান্ত ধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে কথা বলতে এবং সত্য বিষয়গুলো তাদের সামনে তুলে ধরতে। কিন্তু ভ্রান্ত নেতারা আন্তনীকে পাত্তাই দিল না। তারা তাঁকে এড়িয়ে গেল। তাঁর কথা শুনতে চাইল না। তখন আন্তনী মারকিয়া নদীর ধারে গেলেন এবং নদীর দিকে তাকিয়ে মাছদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন- "হে নদ-নদী সমুদ্রের মাছেরা তোমরাই ঈশ্বরের বাণী শোন কারণ ভ্রান্ত/ধর্মদ্রোহীরা ঈশ্বরের বাণী শুনতে চায় না"। রিমিনিবাসীরা অবাক হয়ে দেখল যে, হাজার হাজার মাছ নদীতে মুখ বাড়িয়ে ভেসে আছে আর আন্তনীর কথা মন উজার করে শুনছে।

৪। **সত্যটা গাধাও বোঝে:** "শুধু মাত্র যদি আমার ক্ষুধার্ত গাধা খ্রিস্টপ্রসাদের দিকে প্রণিপাত করে, তাহলেই আমি বিশ্বাস করব যে, খ্রিস্টপ্রসাদে স্বয়ং যিশু উপস্থিত আছেন।" একজন অবিশ্বাসী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সাধু আন্তনীকে এই কথা বলেছিলেন। আন্তনী দৃঢ় বিশ্বাসে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি স্বরূপ অবিশ্বাসী লোকটা পরবর্তী তিনদিন ধরে গাধাকে উপস করে রাখল। অন্য দিকে সাধু আন্তনী প্রার্থনা করলেন আর অন্তরের বিশ্বাস আরো দৃঢ় করলেন। নিদিষ্ট দিনে সাধু আন্তনী পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ একদিকে রাখলেন আর একদিকে অবিশ্বাসী লোকটা রাখল কচি তাজা ঘাস। অবুঝ গাধার এক পাশে লোভনীয় কচি ঘাস আর অন্যদিকে খ্রিস্টপ্রসাদ। লোকেরা টান টান উত্তেজনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কি ঘটে দেখবার জন্য। অতি আশ্চর্যের বিষয় হল ক্ষুধার্ত গাধা কচি কাচা ঘাস রেখে নত মস্তকে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদকে প্রণাম জানালো। জয় সাধু আন্তনীর জয়, জয় পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের জয়।

৫। **পবিত্রতার গুণে, শিশু যিশু তাঁর কোলে:** কাউন্ট তিসু নামে আন্তনীর এক বন্ধু সন্ন্যাসী তাঁকে সন্ন্যাস আশ্রমে নিমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু আশ্রমের ঘরগুলো অতিরিক্ত স্যাঁত স্যাঁতে হওয়ায় সেখানে আর থাকা যাচ্ছিল না। তাই নব নির্মিত আখরোট গাছের উপরের একটা ঘরে আন্তনীকে থাকতে দেওয়া হল। গভীর রাতে কাউন্ট লক্ষ্য করল আন্তনীর ঘর থেকে উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসছে। কৌতুহলী হয়ে তিনি দেখতে গেলেন এবং দেখলেন আন্তনীর কোলে শিশু যিশু তাকে আলিঙ্গণ করে আছে। একজন পবিত্র মানুষের কোলেই কেবল পবিত্র ঈশ্বর এইভাবে আসতে পারেন।

৬। **অনুতাপের দা' কাটল পাপীর পা':** লিওনার্ডো নামে এক যুব সাধু আন্তনীর কাছে পাপস্বীকার করতে এসে বললো যে, সে তার মাকে পা দিয়ে লাথি মেরেছে। সাধু আন্তনী উপদেশে বললেন, যে পা দিয়ে পিতা মাতাকে লাথি মারা হয় তা কেটে ফেলাই ভালো। যুবকটি আন্তনীর কথা আক্ষরিকভাবে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে যে পা দিয়ে মাকে লাথি মেরেছিল তা কেটে ফেলে। সংবাদ শুনে আন্তনী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বিচ্ছিন্ন পা'টি হাতে নিয়ে প্রার্থনা করলেন এবং কাটা পা'টি ধরে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পা আগের মতো হয়ে গেল। যুবক আনন্দে লাফালাফি করে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

৭। **আলেরডিনুর গ্লাস করল সত্য প্রমাণ:** আলেরডিনু নামে একজন নাইট যিনি কাথলিকদের পছন্দ করতেন না। একবার তিনি পাদুয়া আসলেন এবং সন্ধ্যায় খাবারের সময় খাবার টেবিলে তার সঙ্গীরা সাধু আন্তনীর নানা আশ্চর্য ঘটনার কথা তাকে শোনাতে লাগল। আলেরডিনু কিছু বিশ্বাস করল না বরং রাগান্বিত হল, এবং হাতে একটা কাঁচের গ্লাস নিয়ে বলল আমি এই গ্লাসটি এই পাথরের উপর ছুঁড়ে মারবো আর গ্লাসটি যদি ভেঙ্গে না যায়, তাহলে আমি কেবল আন্তনীর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বিশ্বাস করব, বলে হাসতে লাগল। এবং তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে কাঁচের গ্লাসটি হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। ভঙ্গুর কাঁচের গ্লাসটি ভাঙ্গল না, বরং যেখানে গ্লাসটি আঘাত করল সেখানেই ক্ষতের সৃষ্টি হল। আলেরডিনু বিশ্বাস করলো এবং কাথলিক মণ্ডলীতে দীক্ষা নিল।

৮। **ডুবে মরা বালক, পেল পুনঃজীবন:** প্যারিজিও নামে এক বালক বন্ধুদের সঙ্গে নৌকা ভ্রমণে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ল। নৌকা ডুবে যেতে অন্যেরা সাঁতার কেটে তীরে উঠে গেল। কিন্তু প্যারিজিও ডুবে গেল। ঝড় থামলে ডুবুরীরা প্যারিজিও মৃতদেহ উদ্ধার করল। পরের দিন আত্মীয়স্বজন সকলে মিলে মৃতদেহ কবরস্থ করার জন্য নিতে উদ্যোগী হলে মৃত প্যারিজিও'র মা কবর দিতে রাজী হল না। সে বলল আমি সাধু আন্তনীর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি আমার ছেলের জীবন ফিরিয়ে দেবেন আর যদি দেন তাহলে আমার ছেলেকে একজন ফ্রান্সিসকান যাজক তৈরী করব। তিনি কিছুতেই মৃতদেহ কবর দিতে দিলেন না। সাধু আন্তনীর নিকট পরম বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগলেন। মৃত্যুর তিন দিন পর প্যারিজিও জেগে উঠল। তার মায়ের প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্যারিজিও ফ্রান্সিসকান সংঘে যোগ দিল।

৯। **ফিরে পেয়ে প্রাণ, করল রুটি দান:** টমি নামে ২০ মাসের এক শিশুকে রান্না ঘরে রেখে মা অন্য কাজ করছিল। সেখানে একটি বড় পাত্রে ফুটন্ত গরম পানি ছিল। টমি সেই পাত্রের পানিতে নিজের ছবি দেখে তা ধরার জন্য হাত বাড়ায় এবং গরম জলে পড়ে যায়। শব্দ পেয়ে মা আসতে আসতেই টমি গরম জলে ডুবে মারা যায়। টমির মা আহাজারি করতে লাগল। এই খবরে চারিদিক থেকে লোকেরা এসে ভীড় করল, তাদের সঙ্গে কয়েকজন সন্ন্যাসীও এলো তাদের দেখে টমির মায়ের সাধু আন্তনীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা মনে পড়ল। তিনি তখনই জোরে জোরে সাধু আন্তনীর সাহায্য কামনা করে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে যদি তাঁর সন্তান জীবন ফিরে পায় তাহলে তিনি এই সন্তানের ওজনের সমান রুটি কিনে গরীবদের দিবেন। তিনি প্রার্থনা করছেন এবং তার সন্তান পুনঃজীবন লাভ করল। শুরু হলো সাধু আন্তনীর নামে রুটি/বিস্কুট দানের রীতি।

১০। **বিশ্বাসে মিলায় জীবন, আন্তনীর ভক্ত ফিরে পেল মেয়ের জীবন:** আওরেলিয়া নামে এক বালিকা তার মায়ের সঙ্গে তাদের এক অসুস্থ বৃদ্ধা আত্মীয়র সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার

মা যখন ভেতরে গেল আর আওরেলিয়া বাইরে খেলা করছিল। আওরেলিয়ার মা যখন ফিরে এসে দেখে তার মেয়ে একটা পুকুরের জলে ভাসছে। সে কোন মতে মেয়েকে টেনে উপরে তুলে আনল। তার কান্নাকাটিতে লোকে জড় হল একং পরীক্ষা করে দেখল মেয়েটি মারা গেছে। আওরেলিয়া'র মা কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সাধু আন্তনীর নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলেন যেন সাধু আন্তনী যিশুকে অনুরোধ করেন তার মেয়ের জীবন ফিরিয়ে দিতে। তার প্রার্থনারত অবস্থায় মেয়েটি চোখ খুলল এবং সুস্থ হয়ে মায়ের সঙ্গে বাড়ী ফিরে গেল।

**১১। মৃতদেহ সাক্ষ্য দিল:** লিজবন সাধু আন্তনীর জন্মস্থান। সেখানে দুইজন লোক পরস্পরের শত্রু ছিল। একদিন তারা ঝগড়া করতে করতে তাদের একজন ছুরি দিয়ে আর একজনকে হত্যা করল এবং সাধু আন্তনীর পিতা মার্টিনের বাগানে মাটি চাপা দিয়ে রাখল। পুলিশ জানতে পেরে মার্টিনকে খুনি সন্দেহে ধরে নিয়ে গেল। যেহেতু মৃতদেহ তাদের বাগানে পাওয়া গেছে তাই কোর্ট আন্তনীর পিতাকেই দোষী সাবস্থ করতে যাচ্ছিল। সাধু আন্তনী তখন পাদুয়া থাকতেন। লিজবন থেকে পাদুয়ার দূরত্ব ১২০০ কিলোমিটার। সাধু আন্তনী তার মঠ থেকে একরাতের ছুটি নিয়ে মাত্র ২ ঘন্টায় লিসবনে এসে পৌঁছলেন। তিনি কোর্টে সকলের সামনে মৃতদেহকে প্রশ্ন করলেন, কে তোমাকে হত্যা করেছে? সত্যি করে বল। সবাইকে অবাক করে মৃতদেহ কথা বলতে শুরু করল এবং আসল খুনিকে চিনিয়ে দিয়ে সে ফাদার আন্তনীর কাছে পাপস্বীকার করল এবং পুনরায় মারা গেল।

**১২। অনুতাপের তাপে, সকল ব্যথা নাশে:** ইতালীর টসকানো শহরে একজন ধনী ব্যক্তি ছিল। সে খুবই নিষ্ঠুর ছিল। একদিন সে রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পিটালো এবং লাথি মেরে বাড়ী থেকে বের করে দিল। সে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ে রইল। তার বাড়ীর কাজের লোকেরা ও অন্যরা তাকে তুলে তার বিছানায় শুয়ে দিল। এদিকে স্ত্রী যখন মৃত প্রায়, তখন স্বামী অনুতপ্ত হয়ে দৌড়ে আন্তনীর কাছে গিয়ে সাহায্য চাইল। আন্তনী তার সঙ্গে বাড়ীতে এলেন এবং সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করলেন। আর অল্প সময়ের মধ্যেই তার স্ত্রী সুস্থ হয়ে গেল, তার সব ব্যাথা সেরে গেল।

**১৩। অবুঝ শিশুর মুখের বোল, কেটে গেল সন্দেহের হুল:** এক সন্দেহবাতিক স্বামী সব সময় তার স্ত্রীকে সন্দেহ করত যে তার স্ত্রী **অবিশ্বস্ত** তাদের একটা সন্তান হলে তার স্বামী কিছুতেই এই শিশুকে নিজের সন্তান হিসাবে মেনে নিল না। উপায়ন্তর না দেখে এই মা সাধু আন্তনীর স্মরণাপন্ন হল। সাধু আন্তনী এসে, এই স্বামীকে অনেক বুঝাতে লাগলেন। স্বামী বুঝলেও তার মনে যেন সন্দেহ রয়েই গেল। তখন নার্স সেই শিশুকে কোলে করে নিয়ে এল, আন্তনী শিশুটির দিকে ঘুরে তাকে বলল,"যিশুখ্রিস্টের নামে আমি তোমাকে বলছি, তুমি বল তোমার বাবা কে? শিশুটি হাত দিয়ে লোকটিকে দেখিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল "এইতো আমার বাবা"। লোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এইভাবে আশ্চর্য ক্ষমতায় সাধু আন্তনী পরিবারটিকে ভেঙ্গে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন।

**১৪। হবে নিরাময়, যদি কর সাধু আন্তনী'র স্মরণ:** ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে ফাদার আন্তনী মারা গেলে তাকে 'ঈশ্বর জননী' নামে গির্জায় কবরস্থ করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগে হাজার হাজার মানুষ আসে। সেখানে একজন নারী ছিলেন যিনি অনেক দিন ধরে অসুস্থ, তার ঘাঁড়ে একটা বড় টিউমার ছিল। এটা এমন বড় যে সে সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারতো না। সে কোন মতে ক্র্যাচে ভর দিয়ে কষ্ট করে আন্তনীর কবরের পাশে এসে কবরের উপর শুয়ে পড়ে সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। প্রার্থনা করতে করতেই সে অনুভব করল তার ঘাঁড়ে টিউমার নেই, সে লাফিয়ে উঠল, ক্র্যাচ ফেলে রেখে ঈশ্বর ও সাধু আন্তনীকে ধন্যবাদ জানালো।

**১৫। সাধু আন্তনীর পুকুর:** মন্টপেলিয়ের নামক জায়গায় ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম রয়েছে, যেখানে সাধু আন্তনী ছিলেন। অনঅতিদূরে একটি ব্যাঙ ভর্তি পুকুর ছিল। ব্যাঙের সারাদিন ডাকা-ডাকিতে সন্ন্যাসীরা অতিষ্ঠ। এর কর্কশ শব্দে তারা ঠিক মত কোন কাজই করতে পারতো না, না প্রার্থনা, না ক্লাস, না অন্য কোন কাজ। অতিষ্ঠ স্বয়ং আন্তনী নিজেও। তাই ভাবলেন এর একটা সমাধানে আসা দরকার। তিনি পুকুর পাড়ে গেলেন এবং আশীর্বাদ করে ব্যাঙদের আদেশ দিলেন তারা যেন আর ককর্শ স্বরে না চেঁচায়। এরপর থেকে ব্যাঙেদের আওয়াজ আর সেই পুকুর থেকে আসে না। কিন্তু আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হল সেই একই ব্যাঙ যদি সেখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেখানে গিয়ে আবার ডাকা-ডাকি করে।

**১৬। যদি হারাই কিছু, নেব সাধু আন্তনীর পিছু:** হারানো দ্রব্য খুঁজে দেওয়ার অলৌকিক কর্ম সাধক আন্তনী তা আমরা জানি। কিন্তু কেন? জানি কি? মন্টপেলিয়ের আশ্রমে আন্তনী শুধু ঐশবাণী প্রচারের কাজ করতেন তা নয়, তিনি নবিসদের শিক্ষা দিতেন। একবার একজন নবিস আশ্রম ছেড়ে চলে গেল কিন্তু যাওয়ার সময় আন্তনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই নিয়ে গেল যা তার শিক্ষকতার জন্য খুবই জরুরী ছিল। বইটি না পেয়ে তিনি ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা করলেন। এদিকে সেই নবিস যিনি বইটি নিয়েছিলেন পথের মধ্যে একটি নদী পার হবার সময় দেখল এক দানব হাতে একটা কুঠার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বলল, আর এক পা এগিয়ে গেলে পা কেঁটে ফেলবে। আরো বলল, এখনই যেন ফাদার আন্তনীর বইটি ফিরিয়ে দিয়ে আসে। নবিস তৎক্ষণাৎ ফিরে গেল এবং ক্ষমা চেয়ে বইটি ফিরিয়ে দিয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সে আবার আশ্রমে থাকার অনুমতি চাইল।

**১৭। প্রকৃতিও যে দেখি এর কথা শোনে:** একবার এক বৃষ্টির দিনে আশ্রমের বাবুর্চি এসে ফাদার আন্তনীকে বলল যে, ঘরে খাবার মত কিছু নাই। এই বৃষ্টিতে কি করব? আন্তনী একজন ধার্মিকা মহিলাকে চিনতেন। তিনি তার কাছ থেকে কিছু সবজি চাইলেন। মহিলা তার কর্মীকে বলল ফাদার আন্তনীর আশ্রমের জন্য সবজি দিয়ে আসতে। তখনও আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি পড়ছিল। কর্মচারী বাগানে গেল এবং অনেক সবজি কেটে আশ্রমে দিয়ে আসল। ধার্মিকা মহিলা কর্মচারীকে দেখে বলল, কখন যাবে ফাদারকে সবজি দিতে? সে উত্তর দিল আমি তো সবজি দিয়ে আসছি। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যেও আমার গায়ে কোন বৃষ্টি পড়েনি। জামায় জুতোতে কোন কাদা লাগে নি। এরপর যখনই ফাদার আন্তনীর কিছু লাগে আমাকে বলবেন। আমি দিয়ে আসব। তা আবহাওয়া যেমনই থাক। যত ঝড় বৃষ্টি যা হোক ফাদার আন্তনীর জন্য কাজ করলে কোন সমস্যা হবে না।

**১৮। ঘটনা কিন্তু সত্যি! :** একজন সহজ সরল মহিলা যিনি যাজকদের অনেক ভালোবাসতেন। একদিন তিনি কয়েকজন যাজককে তার বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তাই দেখে তার স্বামী অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি মহিলাকে প্রচণ্ড মারধোর করলেন। টেনে টেনে তার মাথার সব চুল তুলে ফেলেন। মহিলা ছিল প্রচণ্ড আন্তনী ভক্ত। তাই কাতরাতে কাতরাতে তিনি তার তুলে ফেলা চুল সব একত্রে জড়ো করল এবং পরের দিন ফাদার আন্তনীর কাছে সমস্ত ঘটনা লিখে একটি চিঠি পাঠালো। ফাদার আন্তনী ঘটনাটি শুনে মর্মাহত হলেন এবং আশ্রমের সকলকে নিয়ে মহিলার জন্য প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা ব্যর্থ হল না। তাঁর সব ব্যথা মুর্হূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল এবং মাথার চুল আগের মতো হয়ে গেল।

**১৯। একেই বলে একের ভেতরে দুই:** ফাদার আন্তনী এক রবিবারে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে গেলেন। খ্রিস্টযাগের সময় তার মনে পড়ল যে, এই সময়ই আশ্রমে তার আল্লেলুইয়া গাওয়ার কথা রয়েছে। তিনি তো ভুলেই গেলেন আর যখন মনে পড়ল তখন তিনি তো আর যেতে পারছেন না। তিনি একটু সময় নিলেন এবং চোখ বন্ধ করে মনে মনে গান করলেন। আর আশ্রমবাসী দেখল আন্তনী তাদের সামনে গান করছেন। অন্যদিকে গির্জা ভর্তি মানুষ দেখছে ফাদার আন্তনী তাদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করছেন। এমনই ঐশ অনুগ্রহে পূর্ণ ছিলেন তিনি।

মহান সাধু আন্তনীর দ্বারা, তাঁর নামে, কত যে অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়েছে তা বলে শেষ হবে না। তিনি জীবনকালে ও মৃত্যুর পরে এবং এমনকি এখনও প্রতিনিয়ত মানুষের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে আশ্চর্য কাজ করে যাচ্ছেন। যদি তা'র সাক্ষ্য গ্রহণ করে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তা অসমাপ্ত থেকে যাবে, কারণ এই আশ্চর্য কাজ চলমান। আসুন আমরা, সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা জানাই আর আশ্চর্য কর্মের অভিজ্ঞতা লাভ করি, তার সাক্ষ্যবহন করি।

# বিশ্বাস ও আশায় পানজোড়াতে সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব

বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতীয় উপমহাদেশে লৌকিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রচার, প্রভাব, অনুশীলন ব্যক্তিজীবনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ঐশ সান্নিধ্য লাভের জন্য মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। ভক্তগণ সৃষ্টিকর্তাকে মনে প্রাণে ধ্যান করে সাধু আন্তনীর মধ্য দিয়ে তাদের কাঙ্খিত প্রার্থনা নিবেদন করেন। অনেকেই মনের প্রশান্তি নিয়ে ফিরে যান প্রাপ্তির আনন্দে। বলা হয় সাধু আন্তনীর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে বিফল হয় না। এমনি প্রত্যাশায় প্রতি বছর, পানজোড়া তীর্থধামে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমাগম ঘটে। এ বছরও বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু আন্তনীভক্তের আগমন ঘটেছে তীর্থভূমি পানজোড়াতে। সাধু আন্তনীর জীবন কাহিনীতে রয়েছে অনেক অলৌকিক ঘটনার সমারোহ। তার জীবনকালে তো বটেই, আজও তাঁর মাধ্যমে প্রার্থনা করে ভক্তগণ পাচ্ছেন কাঙ্ক্ষিত ফল। আন্তনীভক্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। পানজোড়া ক্রমেই হয়ে উঠছে আন্তনী বিশ্বাসীভক্তের তীর্থভূমি। সাধু আন্তনীর জীবনকর্ম, তাঁর গান মানুষের অন্তরে আশা জাগায়। বিপদে আশাহত মানুষ ভরসা পায় মহান সাধক আন্তনীর আশ্রয়ে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে। সাধু আন্তনী এখন বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল, তার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা হলে তিনি ফিরিয়ে দেন না। যতই দিন যাচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে সাধু আন্তনীর প্রতি। এতেই বোঝা যায় বিশ্বাস বিস্তারে সাধু আন্তনী কতটা শক্তিমান। তাই আমাদের আশা ও বিশ্বাস, আমরা যেন কখনো নিরাশ না হই। নিরাশার আশা যিশুভক্ত সাধু আন্তনীর মাধ্যমে প্রার্থনা করে আমরাও যেন যিশুভক্ত হয়ে উঠি।

### খ্রিস্টপ্রেমিক সাধু আন্তনী

সাধু আন্তনী ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট পর্তুগালের লিসবন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা ছিলেন ভিসেন্তে মার্টিন ও তেরেজা পায়িজ তাভেইরা। সাধু আন্তনী ছিলেন ফ্রান্সিকান সংঘের একজন যাজক। ইতালির পাদুয়ায় বেশিভাগ সময় কাটিয়েছেন বলে তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনী নামেই সর্বাধিক পরিচিত। প্রার্থনা, মানত করে বহু লোক ফল লাভ পাচ্ছে। তাঁর অলৌকিক কাজ, যিশুর প্রতি তাঁর ভক্তি ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, ভক্তদের প্রতি কোমল প্রাণ তাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে। সাধু আন্তনীর জিহ্বা যা সব সময় প্রভুর মহিমা ঘোষণা করেছে আজও তা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। আজ সাধু আন্তনী সত্যিই একজন সর্বজনীন সাধু। সারা পৃথিবীর সব ধর্মের লোকদের দ্বারা সম্মানীত। হারানো মেষদের তিনি হলেন বিশেষভাবে প্রতিপালক। তার সারা জীবন তিনি মানুষকে হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাইয়ে দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য, কাউকে আশা, কাউকে গুণ আবার অনেককে তাদের বিশ্বাস। শিশু যিশুর প্রতি সাধু আন্তনীর বিশ্বাস ছিল বলে তার পুরস্কার স্বরূপ শিশুযিশু তার সাথে দেখা ও আলাপ করতেন। তিনি ১২৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন মৃত্যুবরণ করেন। জীবিতকালে তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করে যে সুনাম কুড়িয়েছেন মৃত্যুর পর তা দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। তার জীবন এতই আধ্যাত্মিক ছিল যে, তাকে সাধু বলে ঘোষণা করতে এক বৎসর সময়ও লাগেনি। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে পোপ গ্রেগরী পাদুয়ার আন্তনীকে সাধু বলে ঘোষণা করেন।

### পাদুয়া থেকে পানজোড়ায় সাধু আন্তনী

পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনী নামটি সারা বিশ্বের খ্রিস্টভক্তসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছেও বহুল পরিচিত। মানুষ ভক্তি ভরে তাঁর নাম স্মরণ করে ও তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের নিকট নিজের চাওয়া-পাওয়াগুলো তুলে ধরে। ইতিহাসমণ্ডিত নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোড়া তীর্থস্থান ধর্মপল্লীকে করেছে মাহিমান্বিত ও বিখ্যাত। সাধু আন্তনীর প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাস ও ভক্তির রেশ ধরেই দিনে দিনে পানজোড়া যেন হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের পাদুয়া। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যে কয়েকটি তীর্থস্থান রয়েছে তার মধ্যে নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোড়া হলো অন্যতম। পানজোড়াতে এই মহান সাধু আন্তনীর নামে পর্তুগীজ মিশনারীগণ একটি গির্জা স্থাপন করেছিলেন। সেই থেকে প্রথমে ভাওয়াল অঞ্চলে এবং পরে আস্তে আস্তে দেশের বহু স্থানে খ্রিস্টভক্তদের মাঝে সাধু আন্তনীর এ তীর্থস্থানের কথা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের বিশ্বাস, এই সাধুর কাছে কিছু যাচ্না করলে তিনি ফিরিয়ে দেন না। প্রতি বছর হাজারো খ্রিস্টভক্ত ও অন্যান্য ধর্মের অনেক মানুষ অপেক্ষা করে থাকে পানজোড়াতে সাধু আন্তনীর তীর্থের জন্য। অনেকের মানত পূরণ হবার জন্য আবার অনেকের নতুন মানত করার জন্য। এটি আসলেই অবাক করার মত বিষয় যে অন্য ধর্মের মানুষেরও সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস কত গভীর। হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়া, সুস্থতার জন্য প্রার্থনা, ভালো থাকার জন্য প্রার্থনা আরও বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশে মানুষ তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। সাধু আন্তনীকে হারানো দ্রব্য ফিরিয়ে দেবার সাধু বলা হয়ে থাকে। সর্বোপরি তিনি সকল মানুষের নিকট অনেক জনপ্রিয় মহা সাধক। আর তাঁর প্রতি মানুষের এই ভক্তি বিশ্বাসের জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় সাধু আন্তনীর তীর্থ বা পার্বণ উদ্‌যাপন করা হয়।

### নভেনা এবং তীর্থোৎসব

প্রতি বছরের মত এবছরও অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর পর্ব গত ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার নাগরী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত তীর্থভূমি পানজোড়াতে অতি আনন্দের এবং ভক্তিপূর্ণ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করা হয়। পর্বের পূর্ব প্রস্তুতিস্বরূপ নয় দিন ব্যাপি আধ্যাত্মিকতার সাথে নভেনা করা হয়। প্রত্যেক দিনের নভেনায় সাধু আন্তনীর জীবনের নয়টি গুণ নিয়ে ধ্যান প্রার্থনা করা হয়। নাগরী ধর্মপল্লীর প্রত্যেকটি গ্রাম, হলিক্রস ব্রাদার হাউজ এর ছেলেরা, পানজোড়া হোস্টেলের মেয়েরা অনেক সুন্দর আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিয়ে নভেনায় দায়িত্ব পালন করেছেন। নয়দিনের নভেনায় বিভিন্ন জায়গা থেকে ফাদারগণ এসেছেন এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন, অনেক আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ সহভাগিতাও করেছেন। নভেনা চলাকালীন সময়ে খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ তাদের পাপস্বীকার শোনা হয়। প্রতিদিন নভেনার দুটি খ্রিস্টযাগ হয়েছে সকাল ৬:৩০ টায় এবং বিকাল ৪

টায়। এই নয়দিনের নভেনায় দূর-দুরান্ত থেকেও অনেক মানুষ সাধু আন্তনীর অনুগ্রহ পেতে ছুটে এসেছেন। সাধু আন্তনীর আশীর্বাদ পেয়েছেন, সাধু আন্তনীর অলৌকিক কাজের সাক্ষ্য দিয়েছেন। নয়দিনের নভেনা শেষে খুবই আধ্যাত্মিকপূর্ণভাবে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ করা হয়।

৭ ফেব্রুয়ারী এই তীর্থভূমিতে দুটি খ্রিস্টযাগ হয়েছে। প্রথম খ্রিস্টযাগ হয়েছে সকাল ৭ টায়। প্রথম খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন.ডি' ক্রুজ এবং উপদেশ বাণী রেখেছেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন.ডি' ক্রুজ এবং তিনি অতি অর্থপূর্ণ উপদেশ বাণী রেখেছেন। বিশপগণ অতি আধ্যাত্মিকপূর্ণভাবে সাধু আন্তনীর জীবন, তাঁর জীবনে আশ্চর্য কাজ, ত্যাগস্বীকার, খ্রিস্টযাগের প্রতি তার ভালোবাসা, পরিবারে পিতা-মাতার ভূমিকা, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা, আমাদের করণীয় অর্থপূর্ণভাবে উপদেশের মাধ্যমে সবার হৃদয়ে ছড়িয়ে দেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পরে শান্তির প্রতীক হিসাবে কবুতর উড়ানো হয় এবং নাগরী ধর্মপল্লীর কেন্দ্রীয় যুব সমিতির একটি বার্ষিক মুখপত্রের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠানে দুটি খ্রিস্টযাগে অসংখ্য বিশ্বাসী তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে এবং তাদের উদ্দেশ্য, মানত ও প্রার্থনা মহান সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরেন।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিটি গ্রাম থেকে স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া হয় যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেন। গির্জায় দান তোলার ক্ষেত্রে এবং গির্জার শেষে বিভিন্ন গেটে বিস্কুট বিতরণের সময় তারা সার্বিকভাবে সাহায্য করেন। যেহেতু উক্ত দিনে অনেক মানুষের মিলনমেলায় পূর্ণ ছিল তীর্থস্থানটি তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কঠোর ভাবে নেওয়া হয়েছিল।

এবারের তীর্থে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খ্রিস্টভক্তগণ খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন। তাদের অনেকের জন্য তীর্থ আয়োজক কমিটি ও নাগরী ধর্মপল্লীর বিভিন্ন সংগঠন খাবারের ব্যবস্থা করেন। এতে করে যাদের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই তাদের জন্য বড় ধরনের উপকার হয়। এরইসাথে প্রত্যেকটি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই অতিথিদের আপ্যায়নের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দুটি খ্রিস্টযাগেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আন্তনীভক্তগণ আসেন তার অনুগ্রহ লাভ করতে ও তাদের মানত করতে। শুধু যে খ্রিস্টভক্তরাই এসেছিল তা নয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এসেছিল তাদের মানত সাধু আন্তনীর নিকট তুলে ধরতে। এতে করেই বুঝা যায় যে সাধু আন্তনী কতটা জনপ্রিয় সকলের কাছে, কতটা বিশ্বাস যোগ্য মানুষের নিকট। মানুষ তার কাছ থেকে পায় বলেই যে শুধু তার কাছে আসে তা নয়, সাধু আন্তনীর প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসাও ভক্তদের পানজোরাতে নিয়ে আসে। আনুমানিক ৪০ হাজার আন্তনী ভক্তদের মিলন মেলার মধ্যদিয়ে এইবারের পার্বণ উদ্‌যাপন করা হয়।

সাধু আন্তনীর তীর্থে অংশগ্রহণ করতে পেরে তার ভক্তগণ অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে কৃতজ্ঞ অন্তরে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তাদের অনুভূতি তুলে ধরা হল:

**ফাদার প্রলয় ক্রুশ:** আমরা বিগত নয় দিন ধরে নভেনা করে আসছি এবং প্রথমদিন থেকেই এখানে অনেক মানুষের সমাগম লক্ষ করা গেছে। আমরা উপলব্ধি করি দিনে দিনে খ্রিস্টভক্তদের ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়েছে, হচ্ছে তা আজকে এই পর্বীয় দিনে মানুষের ধল দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবে লক্ষ করা যাচ্ছে, মানুষের তুলনায় এখানে জায়গা অনেক সংকুলান রয়েছে। তাই ঢাকার ধর্মপ্রতিনিধিদের অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে এ বিষয়ে তারা অবগত থাকেন এবং এ প্রাঙ্গণ যাতে আরো সুন্দর করা যায়। এজন্য অনেক মানুষের সহযোগিতা দরকার তাই আপনারাও এ বিষয়ে এগিয়ে আসুন। সকল খ্রিস্টভক্তদের পর্বীয় দিনে শুভেচ্ছা জানাই।

**ফাদার জেভিয়ার পিউরিফিকেশন:** সকলকে সাধু আন্তনীর পর্বীয় দিনে শুভেচ্ছা জানাই। সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান একটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান। দলে দলে সকল খ্রিস্টভক্ত এখানে ছুটে আসে সাধু আন্তনীর অনুগ্রহ লাভের জন্য ও তার কাছে প্রার্থনা অর্পনের জন্য। সাধু আন্তনী ঈশ্বরের একজন প্রিয় সাধু, কাছের সাধু। আর তাই সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করলে তা আন্তনীর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় এবং প্রার্থনার ফল পাওয়া যায়। আর তাই সারা বাংলাদেশের হাজার হাজার খ্রিস্টভক্তগণ তীর্থস্থানে ছুঁটে আসে তার কাছে প্রার্থনা করার জন্য ও বিশ্বাসকে আরো বেশি মজবুত করার জন্য।

**খ্রিস্টভক্ত:** আমাদের কোন কিছু হারিয়ে গেলে সাধু আন্তনীর নিকট প্রার্থনা করলে তা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। আমরা প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো খ্রিস্টভক্ত এসেছি সাধু আন্তনীর সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য এবং তার মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করার জন্য। বাংলাদেশের সকল খ্রিস্টভক্তগণ একযোগে সমবেতভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি এবং তার গুণকীর্তন করি।

**স্মৃতি কর্মকার:** আমি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী এবং আমার বাড়ি বিক্রমপুর। এর আগে আমি সাধু আন্তনীর কথা শুনেছি। আমি এই প্রথম সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে এসে অবাক হয়েছি এত মানুষ দেখে। এখানে আমি আমার ধর্মেরও বহুলোক দেখলাম। কেউ মানত করে পায়রা উড়াচ্ছে, কেউবা মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালাচ্ছে। আমিও ভক্তি ভরে সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা ও মানত করলাম। তিনি যেন আমার মনের ইচ্ছাপূরণ করেন। আগামী বছর আমি যেন আবারও আসতে পারি এবং আমার বিশ্বাস তিনি আমার মানত পূরণ করবেন। আমার বিশ্বাস ভক্তিতে ভগবান মেলে।

**বৃষ্টি ঘোষ:** আমি সনাতনী ধর্মের মানুষ। রনি ম্যাগডেলিনা পেরেরা দিদির মুখে অনেক বার সাধু আন্তনীর কথা শুনে তীর্থস্থানে যাওয়ার ইচ্ছা এবার পূরণ হল। আমার ধর্মেরও অনেক মানুষ সাধু আন্তনীর কাছে কতটা বিশ্বাসে মানত করছে। কেউ মানত করে পূরণ হয়েছে বলে পায়রা উড়িয়ে দিচ্ছে সাধু আন্তনীর নামে, কেউ বা জ্বালিয়ে দিচ্ছে মোমবাতি, আগরবাতি। সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে এসে আমার মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেছে। শেষে বলতে চাই তুমি সাধু আন্তনী ধন্য তোমার মহিমা; কৃপা করো আমাকে আবার যেন যেতে পারি তোমার চরণ ছুঁতে। বিশ্বাস করি তিনি আমার মনের আশা পূরণ করবেন।

**উপসংহার**

এবারও বিগত বছরগুলোর মতই অনেকে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন যেন পানজোড়াতে আনুষ্ঠানিক তীর্থস্থান ঘোষণা করা হয়। এখানে স্থায়ী আবাসনের এবং খাওয়া-দাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হোক, যাতে দূরদূরান্ত থেকে তীর্থ করতে আসা ভক্তগণ এখানে অবস্থান করে নয় দিনের নভেনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। এখন থেকেই ক্ষুদ্র চ্যাপেলটি আরও বড় করার চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। ভক্তগণের অলৌকিক বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে ভিজুয়াল তেমন কিছুই নেই। তাই কিছু স্থিরচিত্র বা পেইন্টিং আঁকা থাকতে পারে দেয়ালে। সাধু আন্তনীর কর্মজীবন নিয়ে ডকুমেন্টারী নির্মাণ, তাঁর পালাগান, সিডি প্রকাশ, তাঁকে নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা এখন সময়ের দাবী। ভক্তগণের অনুপ্রেরণার জন্য, তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য নতুন নতুন পন্থায় প্রচার করতে হবে। তাই সময় থাকতে যেন আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করি। পানজোড়া সাধু আন্তনীর তীর্থভূমি আগামীতে হয়ে উঠুক বিশ্ববাসীর তীর্থভূমি।

# সুস্থ সম্পর্কের মাধ্যমে অসুস্থতা নিরাময়

**লিলি আন্তনিয়া গমেজ**

মানুষ সামাজিক জীব এবং একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আদান-প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কের ভিত শক্ত হয়। মানুষের জীবনে স্বস্তি আসে, একজন অন্যজনকে আপন করে নিতে পারে। এই সম্পর্কের ভিত মানুষের মনের অনেক গভীরে প্রোথিত। তাই যখনই আমরা সম্পর্কের বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করি তখনই আমাদের দুঃশ্চিন্তা গ্রাস করে এবং পরবর্তী কষ্টের এবং বেদনার কথা চিন্তা করে মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। কারণ সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে আমরা একা হয়ে পড়ি। বাড়ে জীবনের অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতা। একাকিত্বের মাধ্যমে মানুষ যেমন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তেমনি অসুস্থ হয় শারীরিকভাবে। এই বিষয়টি কোভিড ১৯ মহামারির সময় যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা অনেক বেশি উপলব্ধি করেছে। অসুস্থতার সময় তাদের পাশে আত্মীয় স্বজনদের পাওয়া যায়নি বলে তারা খুবই মর্মাহত ছিল। অনেকে মৃত্যুর আগে তাদের প্রিয়জনের সঙ্গ পেতে চেয়েছিল; কিন্তু না পেয়ে আত্মীয়স্বজনের অনুপস্থিতিতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। বিষয়গুলো ভাবলেই আমরা আতংকিত হয়ে পড়ি এবং ভাবি আমার মৃত্যুর সময় যেন এই রকম না হয়। কারণ আমরা পরিবারে মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের ভালোবাসা পেয়ে মরতে চাই।

**শিশুর সুস্থতার জন্য ভালোবাসা :** একটি নতুন শিশু যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয় তখন সে মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কেঁদে ওঠে। তখনই স্বাস্থ্যকর্মীরা বা পরিবারের সদস্যরা কাপড়ে জড়িয়ে ধরে তাকে উষ্ণতা ও আরাম দেয়, যত্ন করে ফলে তার কান্না থেমে যায়। এগুলোর মাধ্যমে সে সম্পর্ক খুঁজে পায়। পৃথিবীতে শিশুরা জন্মগ্রহণ করে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্কের মাধ্যমে। আদর, যত্ন ও ভালোবাসার স্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং শিশুও দেহ মনে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে পারে। কোন শিশু যখন কাউকে দেখতে না পায় বা কারো কথা শুনতে না পায় তখনই সে ব্যাকুলিত হয়ে ওঠে, চিৎকার করে এবং কান্না করে। যদি এই দেখা এবং শোনা দিনে দিনে কমতে থাকে তাহলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

**অসুস্থতায় মানুষের মনোযোগ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা :** প্রত্যেক মানুষের জীবনে স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন না কোন অসুস্থ হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। আরো অভিজ্ঞতা আছে, যখনই আমরা অসুস্থ হয়েছি তখনই আমরা অন্যের মনোযোগ পাওয়ার চেষ্টা করেছি। আর যদি তা না পেয়ে থাকি তাহলে প্রচণ্ড মন খারাপ করেছি। অর্থাৎ অসুস্থতার সময় আমরা মিলন ও ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করি। মানুষকে কাছে পেতে চাই। তাই অসুস্থতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সব সময় খারাপ নয়; আমরা যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ তা পুনঃআবিষ্কার করতে পারি। জীবনের ব্যস্ত গতিতে আমাদের জীবনে মানুষের নৈকট্য, মনোযোগ, ভালোবাসা দরকার তা অনেক সময় ভুলে যাই। কিন্তু অসুস্থতা আমাদের ব্যস্ত গতির চাকা কিছুটা সময় থামিয়ে দেয় যাতে স্বভাবসুলভ এই ভাল দিকগুলো আবিষ্কার করতে পারি।

**ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি সম্পর্ক উন্নয়নে বাধা :** বর্তমানে পরিবারে যারা পরিশ্রম করতে পারে এবং ভাল আয় করে তাদেরকে সবাই মর্যাদা দেয়, যত্ন ও ভালোবাসা দেয়। কিন্তু যারা বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থ তাদেরকে পরিবারে একইভাবে দেখা হয় না। অনেক সময় তাদেরকে বোঝা হিসেবে দেখা হয় এবং তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তাড়াতাড়ি তাদেরকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। এমনকি গর্ভের সন্তান পরিকল্পনার বাইরে হলে গর্ভনাশের মতো নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে শিশুকে মেরে ফেলা হয়। তাদের দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা হয়। এই কাজগুলো যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই যেন স্বস্তি পাওয়া যায়; যা সত্যিই অমানবিক। এই কথাটিই যেন পোপ ফ্রান্সিস আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন-"ছুঁড়ে ফেলার নীতি" অনুসরণ করার মাধ্যমে কিভাবে আমাদের প্রিয়জনকেও আমরা ছুঁড়ে ফেলি। আবার যারা দরিদ্র বা অক্ষম তাদেরকেও যত্ন ও সম্মান দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয় না। সমাজে তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাদের সামনে উঠে দাঁড়ানো বা তাদের সমস্যার কথা শোনার বা তাদেরকে সমর্থন করার মতো মানুষ কমে যাচ্ছে। ফলে আমাদের স্বার্থপরতার কারণে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলো ক্রমেই দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তারা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখার চেয়ে মৃত্যু কামনাই বেশি করে। আজ যারা কর্মঠ তারা আগামী দিনে বয়সের কারণে দেহ মনের শক্তি কমে আসবে, বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে এবং একইভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। তাই এখন থেকেই মানুষের এই সম্পর্কের বিষয়ে, মর্যাদার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া দরকার।

**করণীয় :** যেকোন অসুস্থতায় মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ধরনের যত্ন প্রয়োজন তা হলো সহমর্মী ও ভালোবাসাময় অবস্থান। এইভাবে যদি কোন অসুস্থ মানুষকে গ্রহণ করা হয় তাহলে অসুস্থ মানুষের বা রোগীর দৃষ্টিকোন থেকে পরিস্থিতি দেখতে ও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। রোগীকে গভীরভাবে বুঝতে দেয়, সে কেমন অনুভব করে, রোগীর উদ্বেগগুলো কি, রোগীকে কোন ধরনের চিকিৎসা দিতে হবে এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অসুস্থ ব্যক্তির মর্যাদাকে সম্মান করতে এবং যত্ন নেয়ার পাশাপাশি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতে উৎসাহিত করে। এভাবে রোগীদের যত্ন করার অর্থ হলো আমাদের সব ধরনের সম্পর্কসমূহের যত্ন করা। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে, পরিবারের সদস্য, বন্ধুবর্গ, স্বাস্থ্যসেবাকর্মী, সৃষ্টির সঙ্গে এবং আমাদের নিজেরদের সঙ্গে। অনেক সময় বিষয়টি জটিল মনে হলেও সাধারণত এটিই হয়ে থাকে। এই বিষয়টি আমরা উত্তম সামারীয়ের গল্পের *(দ্রঃ লুক ১০:২৫-৩৭)* মধ্যে দেখতে পাই। তিনি পথে থেমে অন্য একজন ব্যক্তির কাছে যেতে পেরেছিলেন, তার কোমল ভালোবাসা দ্বারা তিনি একজন যন্ত্রণাভোগী ভাইয়ের ক্ষতসমূহের যত্ন করেছিলেন। এটি সম্ভব হয়েছিল তার সহমর্মীতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার জন্য। তিনি মানুষকে যত্ন ও সম্মান করার বিষয়টি সর্বোত্তম গুরুত্ব দিয়েছেন।

অসুস্থ ব্যক্তি, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি ও দরিদ্র জনগণ মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে। তাই পালকীয় সব ধরনের কর্ম পরিকল্পনায়, মানবিক বিচার-বিবেচনায় তাদেরকে কেন্দ্রে রাখতে হবে। আমরা যেন কখনই তাদেরকে ভুলে না যাই বরং ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কিছুটা দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে পারি সে চেষ্টা সবার করা উচিত।

***সহায়ক সূত্র:*** *বিশ্ব রোগী দিবসে পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের বার্তা-২০২৪*

# রোমানিয়াতে গ্যারান্টিড ওয়ার্ক পারমিট ভিসা

## কাজের পজিশন/বেতন/কর্মীর সংখ্যা নিচে দেওয়া হলো:

| Vacancy | Salary EURO | Number of Employees |
|---|---|---|
| Hotel Staff (Receptionist) | 500-600 | 85 |
| Hotel Staff (Waiter) | 500-800 | 74 |
| Hotel Staff (Cook) | 700-1000 | 174 |
| Assistant Cook | 450-650 | 17 |
| Factory worker | 450-750 | 72 |
| Driver | 900-1400 | 18 |
| Store Clerk | 450-650 | 15 |
| Production operator | 450-750 | 66 |
| Mechanic | 600-1000 | 19 |
| Maintenance Technician | 700-1000 | 21 |
| Mason | 600-850 | 69 |
| Carpenter | 650-1000 | 19 |
| Assembler | 500-700 | 70 |
| Agricultural worker | 400-700 | 32 |
| Construction worker | 600-900 | 42 |
| Furniture Marker | 450-600 | 15 |
| Electrician | 600-1000 | 37 |
| Welder | 700-900 | 14 |
| Cleaner | 400-800 | 125 |
| Warehouse Worker | 500-700 | 44 |

**Working hour - 8 hour + Over time / Working Days- 6 per week / Contract Duration- 1 year / Age limit- 21-48**
**Document Requirement:** - Passport scan copy front back / Euro pass Cv in single format
Residence proof / Mother, father name / White background photo / Experience and educational certificate if available

# জাপানের পরিবারসহ স্থায়ী বসবাসের সুযোগ!

স্বল্প বিনিয়োগে মাত্র ৩-৬ মাসের মধ্যে বিনিয়োগ ভিসায় জাপানে গিয়ে ব্যবসাসহ উচ্চ বেতনে চাকরী ও বসতি গড়ার অভাবনীয় সুযোগ। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম: এসএসসি পাস। বয়সঃ ৩০-৬০ বছর পর্যন্ত। প্রয়োজনে প্রাথমিক বিনিয়োগ/ব্যাংকিংসহ সাপোর্ট প্রদান করা হবে। জাপানে পৌঁছানোর পর সেটেল হবার জন্য প্রাথমিক সকল সাপোর্ট প্রদান করা হবে। পরিবার সমেত জাপানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

**WORIDWIDE STUDENT VISA**

**USA/Canada/Uk/Australia/New Zealand/Japan/S.Korea/Austria/Italy/Malta/Norway/Denmark/Sweden/Finland/Russia-**তে ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং চলছে।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
*(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)*

হেড অফিস : বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২
(আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
info@globalvillagebd.com

Schooling visa-তে (প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)
USA/Canada/Australia-তে
ছাত্র-ছাত্রীর সাথে অভিভাবকদেরও যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

**আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ আজই যোগাযোগ করুন:**

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
@globalvillageacademybd
www.globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/৫২/২৫

# বিন্দু অক্ষর ভাষা

## ছনি মজেছ

কথাগুলো থড়ে থড়ে যতবার সাজাতে যাই ততবারই কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে; ভেসে ভেসে কিছু কিছু শব্দ চোখের সামনে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। কলমটাও যেন অলস ভঙ্গিতে হাই তুলছে, কালির আঁচড়ে কোন অক্ষরই কাগজের উপড় ছবি এঁকে যেতে পারছে না। কসরত করে যখন আবার লিখতে বসা হলো ঠিক সেসময় জানালার ওপাশ থেকে কেউ একজন দূরালাপন যন্ত্রে কথা বলছে মানে ফোনালাপ করছে "তুমি দেখসুইন-ত ! তাইলে আমি আর কিসু কইবাম না" বুঝতে বাকি রইল না যে, লোকটি ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে। বেশ মজা পাওয়া গেলো, আরো ভালোভাবে শুনতে জানালার কাছে এগিয়ে যাওয়া হলো; নাহ! কেউ নেই একটু দূরে মোবাইল ফোন কানের পাশে ঠেকিয়ে গলির পথ ধরে লোকটি হেঁটে চলে যাচ্ছে। জানালার ধার ঘেষে সেভাবেই ঠায় দাঁড়ানো; কিছুক্ষণ পর গলির পথ ধরে দু'জন কিশোরী কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে, নিজেদের মাঝে খুনশুটিতে বেশ মত্ত, কথার মাঝে প্রায় হেসেই গড়াগড়ি যাওয়ার উপক্রম; কাছে আসতেই তাদের উচ্ছসিত শব্দগুলো কানে এলো "মুই কিন্তু নিজের চোক্ষে দ্যাখসি ... হেইয়া যা সুন্দার" কথাগুলো খুবই মজার লাগছিলো এবারও; কৌতুহল আরও বেড়ে গেল। অপেক্ষা করছিলাম আরও নতুন আঞ্চলিক কথা শুনতে পারা যায় কিনা, তারপর ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করা হলো আর কোনো পথচারী আসছে কিনা! নাহ, কাউকে দেখা যাচ্ছেনা, পেছনে ঘুরতে যাবে ঠিক তখনই গলির রাস্তার উল্টোপাশের বিল্ডিং থেকে একজন ডেকে উঠলো, "কি গো! অক্ষর বাবু জানালার পাশে বইশে বইশে কি কইরছো"? তাকাতেই দেখলাম পাশের বাড়ির বাদশা ভাই গায়ে চাদর জড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অনিচ্ছা সত্তেও প্রতিউত্তর বেরিয়ে এলো, "তেমন কিছুনা বাদশা ভাই, এই আর কি .. জানালার কাছে একটু খাড়াইয়া আছি"। আরো কিছু কথোপকথনের পর তিনি ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। অক্ষর বাবু যেন কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন, কিন্তু নিজের মানে অক্ষর বাবুর তৃষ্ণাটা আরো বেড়ে গেলো, কেমন যেন একটা জানা বিষয়ের প্রতি অজানা আকর্ষণবোধ করছিলেন, কিন্তু কি সেটা ... কি! চিন্তাটা কেমন যেন একটু একটু করে বেড়ে ওঠতে চাইছে; জানার তৃষ্ণাটাও যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। ভাবনার চাদরে ডুবতে থাকা অক্ষর সাহেবের কক্ষের দরজার বাইরে কারো কথা কানে আসছিলো; একটু এগিয়ে দরজাটা আলতো করে খুলতেই স্পষ্ট শুনতে পেলেন, কাজের বুয়া বলছে "আই তার লগে যাইত্তাম ন!" বাহঃ এবার মগজ যেন কিছু একটা বলতে চাইছে; বাদশা ভাই উত্তর বঙ্গের আর বুয়া নোয়াখালীর বাসিন্দা... এইতো মনে হচ্ছে আকর্ষণের উৎস বা কারণটা ঠিক তিনি পেয়ে গেছেন। ড্রইং রুমে এসে টিভি রিমোট চাপতেই দূরদর্শন যন্ত্রটা জীবন্ত হয়ে কথা বলে উঠলো, টিভিটাতে তখন একটা চানাচুরের বিজ্ঞাপন চলছে "চানাচুর ... খাইবার ভারি মজা" বিজ্ঞাপনটায় সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশালসহ আরো নানা আঞ্চলিক ভাষাতে চানাচুরের গুণগান করে গেলো। এইবার তার বোধের দরজাটা আরেকবার কড়া নারিয়ে গেলো, কিন্তু কি সেটা! চিন্তার জালে কিছু একটা ধরা পড়ছে, আবার ছুটে যাচ্ছে যেন! ড্রইং রুমের চারপাশে চোখ বুলিয়ে চলছেন, কিছু একটা বিষয় তো আছে যা তার দৃষ্টি আর মনকে এড়িয়ে যাচ্ছে, সোফায় বসলেন এবার; টিভিটাও বোকার মত চলছে কিন্তু টিভির দিকে তার কোনো মনোযোগ নেই, এদিক-সেদিক তাকাচ্ছেন কিন্তু কি বুঝছেন সেটাই মিলাতে পারছিলেন না। স্বভাব-সুলভ আচরণে বা অভ্যাস বসত সামনে রাখা ছোট টেবিলটার নিচে হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা খুঁজলেন; নাহ নেই! উল্টো উঠে এলো বেশ পুরোনো একটা নাটকের স্ক্রিপ্ট। আনমনে কয়েকটা পাতা উল্টোতেই একটা সংলাপে মনোযোগ আটকে গেলো "হিটল্যার না কি যেন্ নাম ... তাই নাকি তামান দুইনার মালিক হবার চায়" মনটা গেয়ে উঠলো এটা রংপুর-গাইবান্ধার ভাষা! হঠাৎ দরজার দিক থেকে ছোট ভাগ্নেটা দৌড়ে এসে পাশে বসলো, হাতে কিছু ছবি সম্বলিত বই "মামা! মামা? আচ্ছা সত্যিকরে বলতো তোমার নামটা কি? নিজের মুখে বলবে কিন্তু; স্পষ্ট করে!" আলতো হেসে অক্ষর বাবু নিজের নাম বললেন আমার নাম 'অক্ষর'। এবার বিন্দু মামাকে হাতে ধরে থাকা ছবি সম্বলিত বই খুলে বর্ণমালা দেখিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে "কিন্তু মা যে বলেছে এইগুলোর নাম অক্ষর?" অক্ষর সাহেব আলতো হেসে সস্নেহে ভাগ্নেকে কাছে টেনে বলেন, মা ঠিকই বলেছেন এই গুলোই সত্যিকারের অক্ষর। জানো এইসব অক্ষরগুলোকে বর্ণমালাও বলে, আমরা মুখে যে কথাগুলো বলি, মায়ের কাছ থেকে যে ভাষাগুলো শিখি তা এই বর্ণমালার সাহায্যেই কাগজের উপর এঁকে এঁকে যখন নানা শব্দের আকারে মনের ভাবনাগুলো প্রকাশ করি তখনই সেটা বাক্য বনে যায়; আর মনের কথাগুলো নানা বাক্যের মাধ্যমে যখন বুঝিয়ে দিতে পারি তখন সেটা হয়ে উঠছে ভাষা।" বিন্দু আচ্মকা বেশ উচ্ছসিত হয়ে ওঠে "জানো মামা! ভাষা দিদি বলেছে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আমাকে আজই শহীদ মিনার নিয়ে যাবে!" এবার অক্ষর সাহেবের চোখটা কিঞ্চিৎ ঘুরে যায় দেয়ালে ঝুলানো দিনপুঞ্জিকার দিকে, ফেব্রুয়ারি ২১ তারিখটাতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে তার দৃষ্টি। ভাবনার জানালায় এক ঝলক আলো খেলে যায়, বিন্দুর দিকে ফিরে তাঁকান, বলেন "জানো বিন্দু! আমরা প্রত্যেকে জন্ম নেয়ার পর যখন প্রথম কথা বলতে শিখি, সেটা মায়ের কাছ থেকেই প্রথম শিখি আর তাই এটাই আমাদের মায়ের ভাষা! দেশের বিভিন্ন স্থানের মানুষ নানা রকমের ভাষায় কথা বলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলে, আর প্রত্যেক ভাষাই যার যার মাতৃভাষা, মানে মায়ের ভাষা। এই ভাষার জন্য ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি নিজ মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে সে সময়ের পাকিস্তানি সেনাদের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন এই বাংলার সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ আরো অনেকে। তাদের এই আত্মত্যাগের স্মৃতিতেই নির্মাণ করা হয় শহীদ মিনার; আর আজ এই দিনটা শুধু আমাদের দেশের জন্য নয়; সীমানা পেড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা রূপে।" বিন্দু খুব তন্ময় হয়ে শুনছিল মামার কথাগুলো, এবার আলতো করে মামার হাত ধরে সুধোয়, "মামা .. আমাকে নিয়ে যাবে শহীদ মিনারে!" অক্ষর সাহেব বিন্দুর কচি হাতের উপর আরেকটা হাত রেখে চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, চলো আমরা এখনই যাবো! কোমলমতি বিন্দুর মনে অজান্তেই একটা পুলক খেলে যায়, মামার হাত ধরে বাইরে এসে গলির পথ ধরে মামার সাথে পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। বিন্দুর চটুল চোখ জোড়া অবাক বিস্ময়ে দেখে; অক্ষর মামার হাতে তার ছোট্ট কচি হাত, ছোট ছোট পায়ে পা ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে মামার সাথে, সামনে-যে আছে ভাষা দিদির কাছে প্রথম শুনতে পাওয়া বিস্ময়কর অজানা সেই শহীদ মিনার। চলার পথে আশে-পাশের দেয়ালগুলোতে এঁকে রাখা নানা বর্ণ-অক্ষর ... ক .. ব ... ৎ ... আ... ই দেখে বিন্দুর চোখ জুড়িয়ে যায় কোথাও কোথাও আবার রাজপথের মাঝেই সেই শহীদ মিনারের ছবি আঁকা। শরীর-মন ভীষণ ভালোলাগায় ভরে উঠছে বার বার; সামনে যে আছে জীবন্ত আর সত্যিকারের মস্ত শহীদ মিনার। বিন্দু অক্ষর মামার সাথে পা চালিয়ে হাঁটছে সমান তালে, সামনে যে আছে ভাষা দিদির কাছে জানতে পারা স্বপ্নের সেই ভাষা শহীদের মিনার।

# তোষামোদ ও প্রতিফল

পারসিয়ান সম্রাট চোসরস খুবই অসুস্থ ছিলেন এবং এক সময় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি তার সমস্ত মন্ত্রীদেরকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি মনে কর, আমি ভাল শাসক? আমার কাছ থেকে তোমরা কী আশা করো? নির্ভয়ে সত্য কথা বলবে। এ জন্য তোমরা প্রত্যেকে একটি করে মূল্যবান হীরার টুকরো পাবে।"

মন্ত্রীরা এক এক করে সম্রাটের কাছে আসল এবং তারা সকলেই তার উচ্চ প্রশংসা করল। এবার জ্ঞানী বলে পরিচিত এলিম আসল এবং বলল, "মহাশয়, আমি বরং নীরবই থাকতে চাই, শেষে সত্য কথা বলে ফেলি।"

সম্রাট বললেন, "খুবই ভাল, আমি তোমাকে কিছু দিব না। এখন তুমি তোমার মনের কথা নির্ভয়ে বলতে পার।"

মহাজ্ঞানী এলিম বলল, "মহাশয়, আপনি জানতে চান আপনার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি কী চিন্তা করি? আমি মনে করি আপনিও একজন মানুষ; আপনারও কিছু দুর্বলতা আছে এবং বিফলতা আছে, যেমন আমাদেরও আছে। আমি মনে করি আপনি অনেক টাকা ব্যয় করছেন-পার্বণ উৎসবে, রাজপ্রসাদ তৈরিতে এবং সর্বোপরি যুদ্ধে আপনি অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। জনসাধারণ আজ করের ভারে জর্জরিত।"

রাজা যখন এ কথা শুনলেন, তখন তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তারপর সম্রাট তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে সব মন্ত্রীকে একটি করে দামী হীরার টুকরো প্রদান করেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী এলিমকে তিনি প্রধানমন্ত্রী বানালেন।

পরের দিন সম্রাটের তোষামদকারী মন্ত্রীরা তার কাছে ফিরে এসে তাকে বলল, "মহাশয়, যে হীরা বিক্রেতা আপনাকে এ হীরাগুলো দিয়েছে, তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো উচিত, এগুলো নকল হীরা।" সম্রাট উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ তোমাদের কথা যেমন মিথ্যা, এ হীরাগুলোও একইভাবে মিথ্যা ও নকল।"

**মূল গল্প বই:**

*গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা*

*ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি*

## ফেব্রুয়ারির গান গাই

**ক্ষুদীরাম দাস**

আমরা বাঙালি,
ফেব্রুয়ারির গান গাই;
বাংলা মায়ের ভাষায়,
স্বপ্ন উড়াই।
বাংলার নীলাকাশে,
আমার মন ভাসে;
শহীদ মিনারে ফুল ছোঁয়াই,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
রক্তে রাঙানো শহীদ মিনার,
সাজানো ফুলে ফুলে;
৫২-এর আন্দোলন আঁকা স্মৃতি,
রক্ত লালে লালে।
আমরা এখন বাংলা বলি,
বাংলায় স্বপ্ন দেখি;
৫২-এর সাহস নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ,
আন্দোলনের মুখোমুখি।
উর্দুভাষীরা পরাজিত,
বাংলা রাষ্ট্রভাষা;
রক্ত স্রোতের মূল্য দিবো,
দিবো ভালোবাসা।
সালাম, বরকত, রফিক ও
জব্বার-সম্মান জানাই;
তোমাদের বীরত্বগাঁথা
ইতিহাসে পড়ে যাই।

## কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

অরিন রোজারিও
রায়ের দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
৮ম শ্রেণি

## ফাদার হ্যামলেট বটলেরু সিএসসি'র রজত জয়ন্তী উৎসব

**ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা:** গত ১৭ জানুয়ারি সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী, শুলপুরে ফাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস বটলেরু সিএসসি'র যাজকীয় জীবনের ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। সকাল ৯টায় জুবিলী খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন জুবিলী পালনকারী ফাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস বটলেরু সিএসসি। খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, হলিক্রস যাজক সম্প্রদায়ের ভাইস-প্রভিন্সিয়াল ফাদার সুশান্ত গমেজ সিএসসি সহ ১৪ জন যাজক, ২জন সিস্টার, জুবিলী পালনকারী ফাদারের আত্মীয়-স্বজন এবং স্থানীয় খ্রিস্টভক্ত। শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে গির্জায় প্রবেশ ক'রে ফাদার হ্যামলেট বেদীতে ধূপারতি করেন। ২৫ বছরের প্রতীক হিসেবে ৫ জন পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বালন করেন। ফাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস বটলেরু'র সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করা হয়। খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণী রাখেন ফাদার জেমস্ ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসি। তিনি জুবিলীর অর্থ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। একই সাথে ফাদার হ্যামলেটের ২৫ বছরে যাজকীয় সেবাকাজের সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগ শেষে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, যাজকীয় জীবনে ২৫ বছর উৎসব মহাযাজক খ্রিস্টকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতার উৎসব। টিফিন গ্রহণ শেষে সেন্ট যোসেফ্স অডিটোরিয়ামে ফাদার হ্যামলেট বটলেরু'কে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে পালপুরোহিত কমল কোড়াইয়া উপস্থিত সকলকে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

## হলি ক্রস এডুকেশন সেমিনার

**ব্রাদার অয়ন ম্যাথোডিওস গমেজ সিএসসি:** হলি ক্রস ব্রাদারদের শিক্ষা কমিশনের আয়োজনে বাংলাদেশে হলি ক্রস ব্রাদারদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নব নিযুক্ত শিক্ষকদের অংশগ্রহণে বিগত ২৪-২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ দুই দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ঢাকার সিবিসিবি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত মোট ৭৫ জন শিক্ষক, সেই সাথে স্কুলের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য ব্রাদারগণ অংশগ্রহণ করেন। ২৪ জানুয়ারি সকাল ৯ ঘটিকায় সাধু যোসেফ সংঘের প্রভিন্সিয়াল সুপিরিওর ব্রাদার জেমস রিপন গমেজ সিএসসি, ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি, ব্রাদার লিও জেমস পেরেরা সিএসসি এবং ব্রাদার গেরি ফ্রান্সিস বয়লান সিএসসি উপস্থিত থেকে উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ব্রাদার রিংকু হিউবার্ট কস্তা সিএসসি।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শিক্ষা কমিশনের আহ্বায়ক ব্রাদার কাজল লিনুস কস্তা সিএসসি। প্রশিক্ষণ কর্মশালার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও সফলতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি এবং বিশেষ অতিথি ব্রাদার গেরি ফ্রান্সিস বয়লান সিএসসি। দু'দিন ব্যাপি কর্মশালায় "শিক্ষায় হলি ক্রস মূল্যবোধ ও শিক্ষানীতির" বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন।

দু'দিনব্যাপি কর্মশালায় পৃথক পৃথক সেশনের মাধ্যমে শিক্ষকগণ পবিত্র ক্রুশ সংঘের সাথে শিক্ষার দর্শন, বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ, অবদান, অর্জন এবং ব্যতিক্রমী পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। ব্রাদারদের সহভাগিতার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী নবীন ও প্রবীন শিক্ষকদের সহভাগিতা এই আয়োজনকে আরো বেশি প্রাণবন্ত করেছে যা প্রত্যেকজন শিক্ষককে অনুপ্রাণিত করবে শিক্ষাদানে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে। কর্মশালার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য শিক্ষকগণ ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল এন্ড কলেজ এবং নটর ডেম কলেজ ক্যাম্পাস ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। পরিশেষে হলি ক্রস শিক্ষার ঘোষণাপত্র পাঠ ও সকলে একত্রিত হয়ে শিক্ষা সেবায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে এই কর্মশালার সমাপনী ঘোষণা করা হয়।

## তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে জুবিলী বর্ষের উদ্বোধন

**ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও:** গত ১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে জুবিলী বর্ষের উদ্বোধন করা হয়। বিকাল ৫ টায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী ধর্মপাল সুব্রত বনিফাস গমেজ, পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ বেলুন উড়িয়ে ও জুবিলী বর্ষের লগো উন্মোচন করে তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে জুবিলী বর্ষ উদ্বোধন করেন। শুরুতেই জুবিলী বর্ষের তাৎপর্য তুলে ধরেন পাল পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ। পরে জুবিলী বর্ষের লগোর ব্যাখ্যা প্রদান করেন ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও। এ সময় ধর্মপল্লীর অধিনস্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, পালকীয় পরিষদের ১৭টি ব্লকের প্রতিনিধি এবং ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তরাও উপস্থিত ছিলেন। পরে ধর্মপল্লীর প্রতিনিধিরা জলন্ত মোমবাতি হাতে গির্জায় প্রবেশ করে সকলের উপস্থিতিতে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। উপদেশে বিশপ জুবিলী বর্ষের বিভিন্ন বিষয়ে সহভাগিতা করেন।

## দিনাজপুর কাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী/নিবেদিত জীবন দিবস উদ্‌যাপন

**সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি:** বিগত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের কাথিড্রালে নিবেদিত জীবন বা যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী দিবস জাকজমক সহকারে উদ্‌যাপন করা হয়। বিকালে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে যাজকগণ ও সিস্টারগণ কাথিড্রালে উপস্থিত হয়। বিশপসহ প্রায় ১০০ জন ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার অংশগ্রহণ করেন বিকাল ৩:৩০ মিনিটে সহভাগিতা শুরু হয়। সহভাগিতা অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক ব্রাদার জেসান হিউবার্ট রোজারিও সিএসসি ও সিস্টার সিসিলিয়া এসসি সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান। ব্রাদার কাজল লিনুস কস্তা সিএসসি শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর বিশপ এবং আরও ৬ জন বক্তা বিভিন্ন বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন। বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু বলেন, "এ নিবেদিত জীবনে সবাইকে খুশি মনে সেবাদান করা উচিত। তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর ও স্বার্থক হবে।" ব্রাদার বিকাশ বানার্ড কস্তা সিএসসি জীবন সাক্ষ্য সহভাগিতা করেন। সালেশিয়ান সিস্টার জয়িতা তাদের সংঘের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ফাদার সিস্টারদের নিকট খ্রিস্টভক্তদের প্রত্যাশা কি তা ওয়ার্ল্ড ভিশনের ম্যানেজার অরবিন্দ গমেজ ও দিপ্তী লাকড়া খুবই সুন্দর করে তুলে ধরেন। সহভাগিতা শেষ হওয়ার পর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু। অতঃপর বিশপ, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক ফাদার হরি মাকারিয়াস দাস সিএসসি সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বিশপ হাউসে রাতের খাবার গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে উক্ত দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

## কুলাউড়ায় যিশুর নিবেদন পর্ব পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদক:** গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার ধর্মপল্লী, লক্ষ্মীপুর কুলাউড়ায় যিশুর নিবেদন পর্ব পালিত হয়। ধর্মপল্লীতে কর্মরত সকল ফাদার এবং সিস্টারগণ মোমবাতি হাতে শোভাযাত্রা এবং মোমবাতি প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে ব্রতীয় জীবনের নবায়ন করেন। খ্রিস্টযাগে ফাদার পিউস পড়ুয়েং ওএমআই খ্রিস্টীয় জীবন আহ্বান ও ব্রতীয় জীবন আহ্বান নিয়ে সহভাগিতা রাখেন। খ্রিস্টযাগে উপস্থিত হোস্টেলের ছেলেমেয়েদের এবং খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান জীবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা দানের মাধ্যমে নিবেদিত ও ব্রতীয় জীবনের প্রবেশের জন্য আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার, সিস্টারগণকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। নির্দিষ্ট চারজন ফাদার এবং সিস্টার ব্রতীয় জীবনে তাদের জীবন আহ্বান

সহভাগিতা করেন। বিকালে সকল ফাদার সিস্টারগণ পুনরায় সমবেত হয়ে পরস্পরের সাথে তাদের জীবন আহ্বান সহভাগিতা করেন। অবলেট ফাদারস, হলি ক্রস সিস্টারস, মিশনারিজ অফ চ্যারিটি সিস্টারস, ভিএসডিবি সিস্টারস এবং এসএমআরএ সিস্টারস এই ৫টি সম্প্রদায় থেকে মোট ২৯ জন ফাদার, সিস্টার বর্তমানে লক্ষ্মীপুর ধর্মপল্লীতে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন আর এইভাবেই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহভাগিতার মধ্য দিয়ে তারা আনন্দের সাথে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করে যাচ্ছেন।

## কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের নবনিযুক্ত নতুন আঞ্চলিক পরিচালক - ড. আরোক টপ্প্য

**নিজস্ব সংবাদদাতা:** কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের নতুন আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. আরোক টপ্প্য। গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে নবনিযুক্ত আঞ্চলিক পরিচালককে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে বরণ করে নেয় কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। সভাপতিত্ব করেন কারিতাস বাংলাদেশের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক সেবাস্টিয়ান রোজারিও এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন রিমি সুবাস দাশ, পরিচালক অর্থ ও প্রশাসন, কারিতাস বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ভিকার জেনারেল ও কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের চ্যাপলেন ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডি, কারিতাস বাংলাদেশের সাধারণ পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ এবং বিভিন্ন মিশন থেকে আগত ফাদার ও সিস্টারগণ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশপ জের্ভাস রোজারিও নতুন আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্প্যকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এরপর তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ড. আরোক টপ্প্য কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বিশেষ করে আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করবেন ও নতুন নতুন প্রকল্প নিয়ে আসবেন। সর্বোপরি কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এরপর নবনিযুক্ত আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্প্য মহোদয়ের কর্মময় জীবন তুলে ধরা হয়।

নবনিযুক্ত আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্প্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় অফিসসহ কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ সহযোগিতা করবেন কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পরিশেষে তিনি কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলকে আরোও সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কৌশল ব্যক্ত করে তার ব্যক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাস্টিয়ান রোজারিও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি একজন যোগ্য লোককে আমরা কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচন করতে পেরেছি। তিনি কারিতাস রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের উন্নয়নের জন্য তার পরিকল্পনা আমাদের সাথে সহভাগিতা করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি সকলকে নিয়ে কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের উওরোত্তর উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবেন।

## নলুয়াকুঁড়ি কুমারী মারীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

**সিস্টার মিতা রোজারিও এসএসএমআই:** গত ২৭ জানুয়ারি, সোমবার নলুয়াকুঁড়ি কুমারী মারীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নবীনবরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই ছিল পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ফাদার জোভান্নী গরগানো এবং সাথে ছিলেন সকল শিক্ষক ও অতিথীবৃন্দ। অতঃপর শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় প্রদর্শিত হয় ডিসপ্লে। এরপর শুরু হয় খেলাধুলা। খেলার শেষে ছিল নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে নতুন ভর্তি সকল শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয় এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার এবং এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড থেকে আগত অতিথিবৃন্দ। সভাপতি ফাদার জোভান্নী গরগানো এসএক্স সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিনটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

# ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী

## 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
## নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'

প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু
জন্ম : আগস্ট ১৭, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া

আমরা কেউ তোমাকে এখনও ভুলতে পারিনি। তোমার আদর্শ, খ্রিস্টীয় গঠন ও জীবন-যাপনের কথা আজও আমরা মনে রেখেছি। তুমি ছিলে অতীব ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, ত্যাগী, কর্মঠ, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রার্থনাপূর্ণ ধার্মিক। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমার সন্তানেরা আজ প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবার কাজে নিয়োজিত।

তোমার সাথে একাত্ম হয়ে স্বর্গসুখ পেতে আমাদের ঠাকুমা-ও চলে গেছে তোমার সাথে পরম পিতার কাছে।

স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শে (ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা) আমরা এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে পারি।

ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই
শোকার্ত পরিবারবর্গ
ব্রাইট, প্রিয়ন্তি, প্রসিত, রনব সহ সকল
নাতি-নাতনীরা এবং তিন ফাদার, তিন সিস্টারসহ সকল সন্তানেরা।

বিজ্ঞ/৪৮/২০২৫

# পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে ভারত থেকে নিয়ে আসা ছোট-বড় মূর্তির এক বিশাল সমাহার।

* ফাইবারের তৈরী কুমারী মারীয়ার মূর্তি
* সাধু আন্তনীর মূর্তি
* যিশুর মূর্তি
* বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর মূর্তি।

এছাড়াও রয়েছে – ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা। স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

–যোগাযোগের ঠিকানা –

**খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র**
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

**প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)**
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ০৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 06
Regd. No. DA-33
❖ 16 - 22 February, 2025, ৩ - ৯ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

# সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

## গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

### ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ | ৪০০ টাকা |
| ভারত | ইউএস ডলার ১৫ |
| মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া | ইউএস ডলার ৪০ |
| ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া | ইউএস ডলার ৬৫ |

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

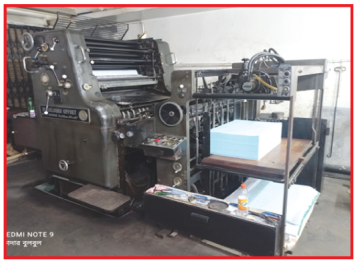

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

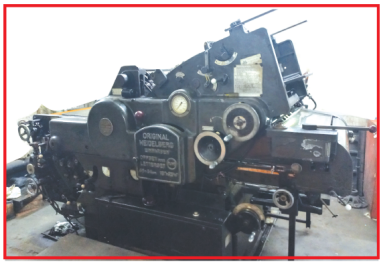

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org